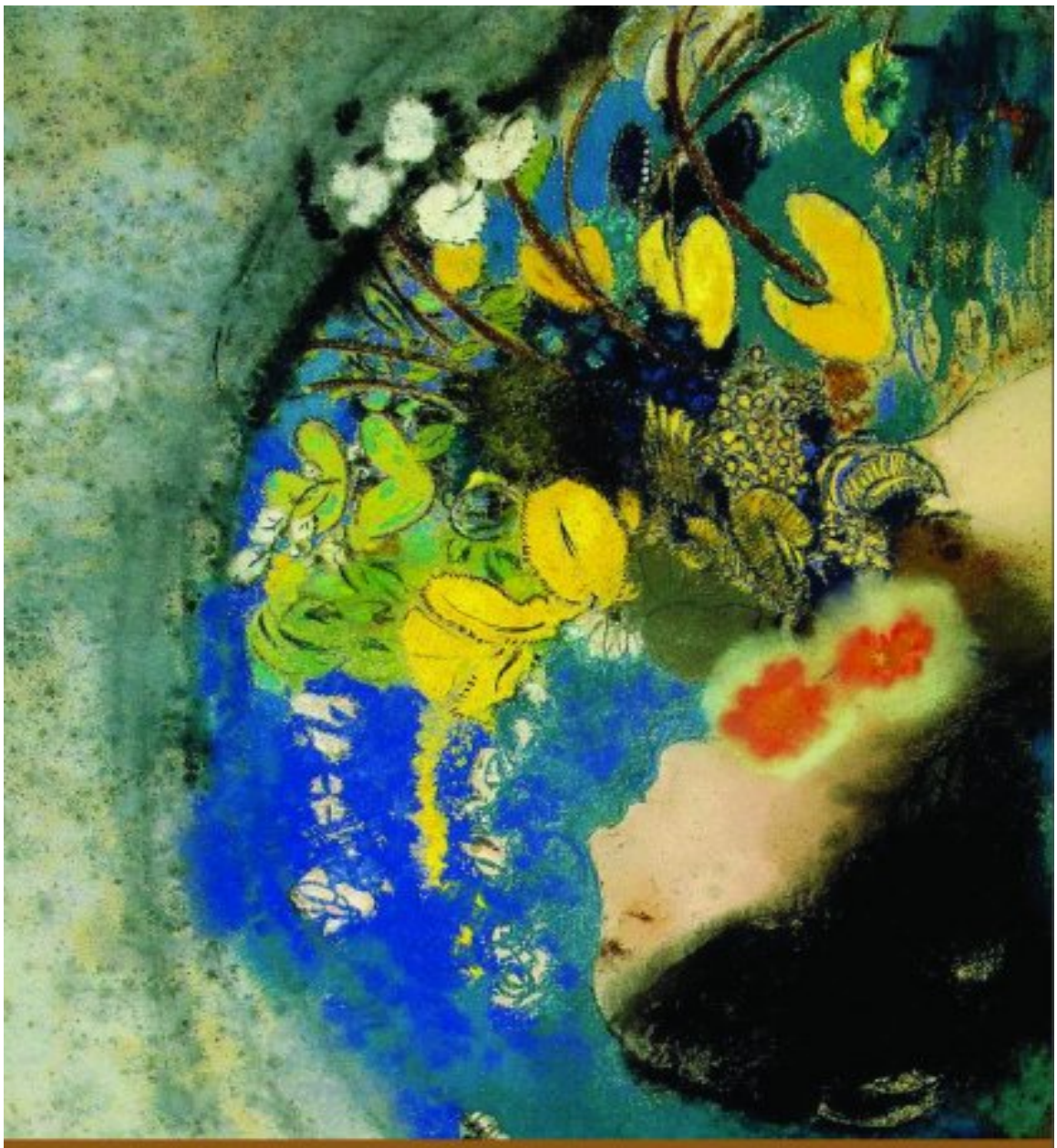

আমাদের শব্দগুলি এইখানে আছে

ফাহিমা দুররাত

সারওয়ার রেজা

আমাদের শব্দগুলি এইখানে আছে

ফাহিমা দূররাত
সারওয়ার রেজা

গল্পগ্রন্থ

আমাদের শব্দগুলি এইখানে আছে

গ্রন্থস্বত্ব
আহ্‌নাফ রেজা আর্য

প্রথম প্রকাশ
একুশের বইমেলা ২০১০

প্রচ্ছদ
ওডিলন রেডনের ‘ওফেলিয়া’ অবলম্বনে

মুদ্রণ
পুনর্ভবা অফসেট প্রেস, ঘাসিপাড়া রোড, গণেশতলা, দিনাজপুর

পরিবেশক
জনান্তিক, ৫০ আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা

উৎসর্গ

বন্ধুদের

সূচিক্রম

ফাহিমা দূররাত

রানু তুমি যেখানেই থাকোনা কেন
তুই
বিকার, নির্বিকার
ব্যবচ্ছেদ
খসড়া

সারওয়ার রেজা

অপ্রাসঙ্গিক
ঘুড়ি-চিল-হাওয়ার গল্প
বিদায় মেঘনীল, অথবা পারমিতা
বোঝাপড়া

আমাদের শব্দগুলি এইখানে আছে

রানু তুমি যেখানেই থাকো না কেন

সুপারমার্কেটগুলির কাউন্টারে যারা দাঁড়ায় তাদের কখনো খেয়াল করে দেখেছেন? করলে হয়ত রানুকে দেখে থাকতে পারেন। নেমট্যাগ দেখে নাম জানতে পারবেন। অবশ্য ওই পর্যন্তই। সে যে প্রিয়া গ্রুপ ওফ ইন্ডাস্ট্রিজের ক্রাউন প্রিন্সেস অর্থাৎ কিনা ওদের বড় ছেলের বউ, একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ-ই ছোটবেলার বান্ধবী শাহানার কাছে একটা মহিলা হোস্টেলে এসে উঠেছে এবং শাহানারই সুপারিশে এই চাকরিটা জোগাড় করে এখন আলু পটল এবং কর্নফ্লেক্সের হিসাবনিকাশ করছে সেসব আপনার জানবার কথা না।
কিছু একটা আন্দাজ করে থাকতে পারেন, হয়ত সেদিন দুপুরে ইমতিয়াজ এসে যখন রাগারাগি করে গেছে তখন আপনি কাছেপিঠেই ছিলেন, রানু হয়ত সে সময় আপনারই জিনিসপত্রের হিসাবনিকাশ করছিল।
তবে বাংলাদেশে তো আর বিলেত আমেরিকার মত খবরের কাগজে বড়লোকদের ছবি ছাপেনা, ট্যাবলয়েডের সংখ্যা এখনো কম বলেই হয়ত- শাজনীনের মতো হলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু ইমতিয়াজদের পরিবারের কোনোরকম 'কাহিনী' পত্রিকায় আসার কথা কল্পনাও করা যায় না ।
সুতরাং ইমতিয়াজকে আপনি চেনেননি। দোকানে এদের চাপা গলার ঝগড়াঝাটি শুনে হয়ত একটু বিব্রত হয়ে চোখ ফিরিয়েই নিয়েছিলেন।
ইমতিয়াজ তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে সোজাসুজি এসে বলেছিল, 'চলো, বাসায় চলো।' শুনে রানু একটা লম্বা কাঁপা নিঃশ্বাস টেনেছে।
তারপর কথোপকথন এরকমঃ
'রানু?'
'উঁহু'
'কেন!'
'আমি তো ভালো আছি'
'বাসায় যেতে সমস্যাটা কী?'
এপর্যায়ে ইমতিয়াজ খেয়াল করল আপনি সোজা এইদিকেই তাকিয়ে আছেন, তখন সে একটু লাল হয়ে চুপ হয়ে গেল।
রানু বলল, 'আমি এখন বাসায় যাবো না'
ইমতিয়াজ জবাব দিল না। রানু তখন আপনার দিকে তাকাল, তারপর মুখ নিচু করে একটু হাসল। আপনাকে বলল, 'বারোশ' চৌষট্টি টাকা,' বলে জিনিসপত্রগুলি একটা থলিতে ভরে ঠেলে দিল।
এরপর থেকে আর কি কি হয়েছে আপনার আর জানার কথা না, কারণ আপনি তক্ষুণি থলেটা নিয়ে বেশ স্মার্টলি বের হয়ে গেছিলেন ভাবখানা এমন যেন আমি-তো-কিছুই-শুনিনি। রানুর এরপরের কথাটা কানে

এলে আপনি হয়ত দরজার কাছে এসেও একটু দাঁড়াতেন। ও বলেছিল, 'তুমি সবসময়... আমাকে নিয়ে...বিব্রত'
জবাবে ইমতিয়াজ ভ্রু কুঁচকে বলেছে, 'সেটা আমি কখন বললাম' এইটুকু বলতেই আরেকজন কাউন্টারে এসে দাঁড়িয়েছে, ওমনি সে ওইখানেই হল্ট করে গেছে।
রানু তখন আরেকটা হাসি দিল।
এবার ইমতিয়াজ মরিয়ার মতো বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, বাসায় যেতে সমস্যাটা কী বলো'
'আমার ইচ্ছা করছে না'
'ইচ্ছা করছে না!'
'কেন? তোমারও তো কত সময় কত কিছু ইচ্ছা করে না'
এই সব বলতে বলতে সে কিন্তু সামনের মহিলার জিনিসপত্রের হিসাব করে ফেলেছে। আর ইমতিয়াজ সেই মুহূর্তে তাল হারিয়ে ফেলে কথা খুঁজছে, কারণ, এই তর্কটা পুরনো।

'ঠিক আছে, তোমার অফটাইম কখন বলো'
রানু মহিলার ট্রলি ঠেলে দিয়ে ঘড়ি দেখে বলল, 'আরো দেড় ঘন্টা বাকি আছে'
এইটুকু বলতেই আর একজন এসে পড়ল, রানু একের পর এক নুডুলস, সস, মাছের প্যাকেট ইত্যাদি বের করে করে কম্পিউটারে দাম ঠুকতে লাগল।

ইমতিয়াজ এতোক্ষণ পকেটে হাত ঢুকিয়ে গোমড়ামুখে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে বলল, ' I never made you go through such hell'
রানু বলল, 'আমি কী করলাম!'
'লোকজনের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে আমার জান বের হয়ে যাচ্ছে'
'সে তো আমারও, দাওয়াতে, ইমতিয়াজ আসেনি কেন বলতে বলতে জান বেরিয়ে যায়'
এই কথাটাও পুরনো। ইমতিয়াজ কাজেই লাল হয়ে গিয়ে বলল 'it's not the same'
'কেন? কী বলছে সবাই?'
ইমতিয়াজের মত একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোকের পক্ষে জনসমক্ষে এরচেয়ে বেশি ঝগড়া করা সম্ভব ছিল না। রেগে ব্যোম হয়ে সে বেরিয়ে গেল।
রানু তখন ওই লম্বা, কাঁপা নিঃশ্বাসটা বের করে দিয়ে বলল, 'তেরশো চৌষট্টি টাকা'

এরপরের দুইদিন রানু হিসাবে দুই চারটা ছোটখাট ভুলটুল করল আর অফটাইমের সময় কাউন্টার থেকে বেশী দূরে গেল না।

এইসময়ের মধ্যে আপনি হয়ত আবার ওই দোকানেই কেনাকাটা করেছেন আর রানুই হয়ত হিসাবনিকাশ করেছে তবু আপনার ওকে মনে রাখার কথা না, কারণ, আপনি তো আর জানেন না ও কে।
তাছাড়া সেভাবে চোখেও পড়ার কথা না, কারণ প্রিন্সেস হিসাবে রানুর গল্পটা অনেকটা সিন্ডারেলার মত; যে কারণে ইমতিয়াজের বোনের চেহারায় যে জেল্লাটা দেখা যায়, রানুর চেহারায় সেটা পাবেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় রানু হোস্টেলে ফিরলে শাহানা বলল, 'তোর জন্য একটা জিনিস আছে'

জিনিসটা একটা ফুলের তোড়া - গোলাপ। তাতে একটা ছোট্ট কার্ড আটকানো। ইমতিয়াজের ষোল বছর বয়সের মুভির নায়কেরা যেহেতু বাংলায় নোট লেখে নি, তাই, আর তাছাড়া ইংরেজিতে অসহায়ত্বটা সেরকম খোলাখুলি প্রকাশ পায়না বলে, লেখা, dinner tomorrow? Savour, 7:00pm. I'll send the car. Please, come.

রানু ফুলগুলি রেখে চোখেমুখে পানির ছিটা দিতে গেলো। শাহানা বলল, 'আমি কিন্তু পড়ে ফেলছি'

রাতে শোয়ার সময় সে নোটটা আরেকবার পড়ল। অন্য বিছানা থেকে শাহানা বলল, ' যাবি তো?'
রানু একটা ছোট্ট হাসি আটকাতে পারল না 'পুরুষমানুষ!'
হাসির ব্যাখ্যাও দিল সাথে সাথে 'একটু ভয় দেখিয়ে দে, তাহলেই, অন্য মহিলাদের সাথে যেরকম ব্যবহার করে তোর সাথেও সেরকম করবে'।
'তোর বরের কি ওইসব সমস্যা না কি?'
রানু লেপ টানতে টানতে মাথা নাড়ল। ইমতিয়াজের ওইসব সমস্যা নেই।
'তাহলে?'
এবার সে একটু হেসে চোখের উপর হাত চাপা দিলো।
এ জিনিসটা আমি খেয়াল করেছি, হয়ত আপনিও করেছেন; মানুষ খুব গাম্ভীর্যের সাথে জবাব এড়িয়ে গেলে, অর্থাৎ ভাবখানা যেন, বলা যাবে না, তার একটা অর্থ এইরকমও হতে পারে যে জবাবটা তার জানা নেই আসলে।

শাহানা এতকিছু ভাবল না, তবে, দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকা-এখন বড়লোকের বউ বান্ধবীর প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হ'ল। হোস্টেলের ভাড়া রানু যতটা কম বলে মনে করে তত কম না।
তারপর আবার 'রানুটার কী হল, দুশ্চিন্তায় পড়া গেল' এরকম কিছু ভাববার চেষ্টা করতে করতে শাহানা তো একসময় ঘুমিয়ে পড়ল; ঘুমের ভান করে পশ্চাদপসারিত রানুর ঘুম এল না পরদিন কী কথা হবে সে চিন্তায়।

পরদিন, মেন্যু দেখতে দেখতে ইমতিয়াজ এবং রানু দুজনই ঠিক করল এখন ঝগড়া করার কোনো মানে হয় না।
রানু ভাবল, আচ্ছা থাক আজকেই রাগারাগি করার দরকার নেই।
ইমতিয়াজ ভাবল, ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে শুনিয়ে আজকের মধ্যে ব্যাপারটা সারতে হবে।

এরকম একটা রেস্তোঁরায় আলো আঁধারিতে হালকা মিউজিকে ছুরি চামচ দিয়ে খেতে খেতে মৃদুস্বরে গল্পগুজব করতে হয়। খেতে খেতে দুজনই বুঝতে পারলো পারস্পরিক কুশল বিনিময় বাদে তাদের আসলে কথা বলার তেমন কিছু নেই। ইমতিয়াজের মনে পড়ল সেন্ট অফ আ ওমেন-এ এরকম একটা রেস্তোঁরায় চমৎকার একটা ট্যাঙ্গোর দৃশ্য আছে; আর রানু যেন কোথায় পড়েছিল এই রকম একটা রেস্তোঁরার ম্যেনুতে আলু ভর্তাকেও লিখতে হবে স্ম্যাশ্‌ড পটেটো উইথ মাস্টার্ড অয়েল এন্ড চপ্‌ড অনিয়ন, সেটা ভেবে ও একটু হেসে দিল।
কফি খাবার সময় অবশ্য নিজের হাতের দিকে মনোযোগ দিতে হয় না, বিপদে পড়ল তাই দুজনেই। এরপর কথোপকথন এরকমঃ
'তাহলে আমার সাথে বাসায় চলো'

‘না’
‘সমস্যাটা exactly কোথায়?’
‘সমস্যা নেই’
‘তাহলে?’
রানু জবাব দিতে পারল না।

তারপর, খানিক্ষণ পর বলল, ‘আমি কোনোদিন তোমাকে কোনো সমস্যায় ফেলিনি’
‘that doesn’t mean যে এখন সমস্যায় ফেলাটা খুব fair হচ্ছে’
রানু এবারো কিছু বলল না।

‘one fine morning, I wake up and learnt that my wife has left. Out of the blue’

রানু হাসবার মত একটা ভঙ্গী করল।

ইমতিয়াজ বলল, ‘আমি কী করেছি বলো।
এমনতো না যে আমরা কোনো ঝগড়াঝাটি করেছি।
তাহলে কেন তুমি-’

‘আমি চাকরিটা ছাড়তে চাই না’
‘ঠিক আছে। তাতে বাসায় যেতে সমস্যা কোথায়’
‘সমস্যা নেই’
‘তাহলে?’

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর রানু বলল, ‘আমাদের বিয়েটা যদি স্বাভাবিকভাবে হ’ত, তোমার সাথে কখনো আমার বিয়ে হ’ত না’
ঠিক প্রশ্ন না, মন্তব্য। এটা ইমতিয়াজের খুবই অপ্রিয় একটা প্রসঙ্গ। সে রেগে লাল হয়ে বলল, ‘এসব নিয়ে আবার কি?’
‘আমি দেখতে তো খুব সুন্দরও না, তুমি বরং দেখতে ভালো’
ইমতিয়াজ জবাব না দিয়ে রাগে লাল নীল হতে লাগল। রানু চোখ নামিয়ে কফি খাচ্ছে। ইমতিয়াজ বলল,‘তুমি বাসায় চলো। এসে বরং, পরে বরং...একটা বুটিক, বা ...’ রানুর ঠোঁট বাঁকছে দেখে ও থেমে গেল।
রানু হাসছে। ‘তুমি বরং ফারিহাকে বিয়ে করতা, ও কত সুন্দর, বা এষাকে, ওকেও খুব মানাত’
কাপটা শক্ত করে ধরে ইমতিয়াজ বলল, ‘তুমি কি...আমি কি...আমি কি কখনো?’
‘চ্-চ্! তা না’
‘তাহলে?’
চুপ। কফি শেষ। দুজনেই চুপ।

‘আমার যে মাঝে মাঝে’ ইমতিয়াজ বলল ‘কিছু ভালো লাগে না, বেশি কথা বলতে ভালো লাগে না, তুমি কি সেসব নিয়ে...?’
‘মাঝে মাঝে তুমি দিনের পর দিন কোণার ঘর থেকে বের হও না’
‘হ্যাঁ, তুমি কি সেসব নিয়ে রাগ করেছ?’

রানু কিছু বলল না। ভেবে দেখল। সেসব নিয়ে কি?

‘আমি তো রাগ করিনি’
‘স্টাডিতে আমি...এমনি বসে থাকি, গান শুনি, মুভি দেখি, এইসব।
আমি...’
‘সিনামা দেখার সময় কেউ ঢুকলে রেগে যাও’
‘রেগে যাই না! ... মাঝে মাঝে আমি একলা মুভি দেখতে পছন্দ করি, একটানা -’
‘কেউ মাঝখানে একটা জরুরী কথাও বলতে পারবে না? আমি কি করে জানব তুমি মুভি দেখছ?’

ইমতিয়াজ কিছু বলল না। রানু একটু মৌরি মুখে দিল। দুজনই চুপচাপ। ইমতিয়াজ বিলের বইয়ের ভেতর টাকা রাখল। ওয়েটার সাথে সাথে এসে তুলে নিয়ে গেল।
রানু বলল, ‘আমি আসলে তোমার যোগ্য না।’

‘থামো তো’
‘তুমি অনেক...’
‘এভাবে কথা বললে-’
‘তোমার আসলে অনেক অন্যরকম একটা মেয়েকে...’

ইমতিয়াজ প্রচন্ড রেগে উঠে দাঁড়াল। রানু বলতে যাচ্ছিল, বসো, কিন্তু তার আগেই ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে। ওয়েটার চেঞ্জ নিয়ে ফিরে এলো। পাঁচশো বিশ টাকা ফেরৎ এসেছে। পাঁচশো টাকাটার কী হবে?

তখন বাজে রাত দশটা।
রানু থাকে নাখালপাড়ার কাছাকাছি।
রাস্তাটা যেরকম ভেতরের দিকে, সেরকম খারাপ - সিএনজির প্রচন্ড শব্দের মধ্যে লুকিয়ে ও একটু কাঁদল।
ও ভেবেছিলো ইমতিয়াজ পৌঁছে দেবে, নইলে কিছুতেই এতো রাত করতো না। সবগুলি ওয়েটার ওর দিকে তাকিয়ে ছিলো।
অন্য কোনো মেয়ে হলে ইমতিয়াজ জীবনেও এরকম করত না। যতই রাগুক ঠিকই বাড়ি পৌঁছে দিত, গাড়ির দরজা খুলে দিত, বলত, ‘তোমাকে আজকে অনেক সুন্দর লাগছিলো’ তারপর ‘আসি, হ্যাঁ ? good night’ বলে বিদায় নিত।
ইমতিয়াজ অবশ্য রানুর সাথে ম্যানার্স নিয়ে অতো মাথা ঘামায় না। ও হয়ত ভাবে যে রানু এসব ওর কাছ থেকে আশা করে না। ও হয়ত আশা করে রানুর সাথে এসব করতে হবে না।
তাছাড়া এমনতো না যে ওকে কেউই দরজা খুলে দেয় না, দেয়। অন্যরা দেয়।

শাহানা রানুর চেহারা দেখে সেদিন রাতে আর কোনো প্রশ্ন করে নি । পরেরদিন বলল, 'কী হ'ল রে?'
'কী?'
'ঝগড়া করে আসলি?'
'না, ঝগড়া না'
'তাহলে? মন খারাপ যে?'
রানু জবাব দিল না ।

তখন রাত সাড়ে বারোটার মত বাজে ।

দেড়টার দিকে রানু হঠাৎ উঠে বাতি জ্বালালো । শাহানার ঘুম চলে এসেছিলো । সে চমকে চোখ মেলল ।

'আচ্ছা বল্ তো শাহানা' রানু বলল 'আমি যদি আর কখনোই বাসায় না যাই, তাহলে?'

'বাসায় যাবি না!'

'যদি না যাই । এই চাকরি সারাজীবন করব?
কতদিন চলবে?
হোস্টেলের ভাড়াই তো কুলায় না ।
পড়াশোনাটাও শেষ করলাম না ।
ভাইয়ের কাছে তো গিয়ে কান্নাকাটি করলেও জায়গা হবে না'

শাহানা জবাব দিলো না ।
রানু বলল, 'আমি যে লেফট-রাইট করে বের হয়ে চলে আসলাম, আমার কি আর ফিরে না গিয়ে উপায় আসে? আমাকে তো ফিরে যাইতেই হবে, কেউ জিজ্ঞেসও করবে না কেন ফিরে আসলা । কারণ আমি তো একলা একলা এভাবে থাকতেই পারবো না । সবাই জানে, আজকে হোক, কালকে হোক, আমাকে তো ফিরে যাইতেই হবে । আমার আর উপায় কী?'

শাহানা এবারও কিছু বলল না । কী বলবে? তাছাড়া প্রতিদিন সেই ভোরে উঠতে হয়, ওর প্রচন্ড ঘুমও এসেছে । রানু জবাবের কথা ভাবছিল না । ও নিজে থেকেই আবার বলল 'আজকে যদি ও অন্য একটা মেয়েও নিয়ে আসে, তাহলেই বা আমি কোথায় যাব? সত্যি সত্যি যদি চলে যাইতে চাই আমার তো জায়গাই নাই'

শাহানা কিছু বলল না । রানুই আবার বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল ।

রানু যে চলে গেছে সেটা প্রথম টের পেল সুপারমার্কেটওয়ালারা । কারণ সেদিন সে কাজে যায় নি, কোনো খবরও দেয় নি । ওরা অবশ্য ভেবেছিল অসুখ বিসুখ ।

শাহানা টের পেল সন্ধ্যায়, ও ফিরে না আসায়। ইমতিয়াজরা জানল চারদিন পরে, চারদিন পর ইমতিয়াজ খোঁজ করেছিল।

আপনি জানলেন ষষ্ঠ দিনে, যদি পত্রিকার ভেতরের পাতায় ছোট্ট কলামটা পড়ে থাকেন, থানা পুলিশ করা হয়েছিল বলে খবরটা ছড়িয়ে যায়।
তবে ছবি আসে নি।
পরের একবছর ইমতিয়াজ মাঝে মাঝেই শাহানার সাথে যোগাযোগ করত, আস্তে আস্তে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। শাহানার এখন বিয়ে হয়ে গেছে, চাকরিটাও আগের চেয়ে ভালো। পুরনো বান্ধবীদের কারো জন্যই তেমন খারাপ লাগে না। রানুর কথা মনে পড়লে একটু অবাক লাগে শুধু।

ইমতিয়াজ আবার বিয়ে করেছে কি না সেটা আমি ঠিক জানি না, তবে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকার কারণ যে নেই সেটা বুঝতে পারছি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কিছু ফোটোগ্রাফ এবং কাগজের মর্গে ঐ ছোট্ট খবরটা ছাড়া, সুপারমার্কেটের সেই মেয়েটার, যাকে একটা লম্বা চওড়া, ফিটফাট চেহারার ছেলের সাথে ঝগড়া করতে দেখা গেছিল, তার কোনো অস্তিত্বই নেই।

কিংবা হয়ত আছে।

যাই হোক, আমার গল্প ফুরল।

অপ্রাসঙ্গিক

আলোটা ঝাক্ করে চোখে লাগার সাথে সাথেই ঝাঁঝালো পেচ্ছাপের গন্ধটাও নাকে ঢুকে পড়লো।

শালা! রোজ বলা যে বাইরে গিয়ে করবি। এইটুকু হেঁটে যাবেনা! জানালা দিয়ে বাইরে ছাড়তে ছাড়তে মেঝেসহ ভিজেছে।

একপাশে ক্যারামবোর্ডটা কেঁতরে পড়ে আছে। বোতলগুলোর সঙ্গেই জঘন্য একটা ভঙ্গিতে পড়ে বিশ্রি চিকন সুরে ফর্ ফর্ করে নাক ডাকছে রুস্তম। জিপারটা তখনো খোলা, ভেতরের ক্যাটক্যাটে লাল জাঙ্গিয়াটা দেখা যাচ্ছে। শালার জাঙ্গিয়ার রং কেউ লাল কেনে!

ভাঙা ঘুলঘুলি আর জানালার ফাঁক ফোকর দিয়ে সকালের তেড়িয়া রোদটা ছেনে দিচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি গাঁথুনির টিনের ছাপড়া দেয়া দশ ফুট বাই বারো ফুট ক্লাবঘরটার একটা পাশ, যেপাশে মানিক এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল। শিবু আগেই উঠে ভেগেছে। বাপে তোয়াক্কা না করলেও নিজের গরজে আক্ষরিক অর্থেই বাপের হোটেলে বসা লাগে ওর। নইলে ফূর্তি করার, মালপানি খাওয়ার টাকাটা জুটতোনা।

আর ছিল মোতা, মোতালেব। লাইনের বাস চালায়। রাতেই ফুটেছে সে। বৌ-বাচ্চা সহ ফুল ফ্যামিলি-পাবলিক।

মানিকের ঐসমস্ত ব্যাপার নাই। মা মরার পর আরেকটা বিয়ে করার জন্য বাপটা যে পাঁচটা মাস সময় নিয়েছিল তাতেই সে বাপের উপর খুশি। তার থেকে লাখ তিনেক টাকা বের করতে পেরে ভক্তি বেড়ে গেছিল আরো। সেবারই ঐ টাকায় বাসস্ট্যান্ডে টায়ার টিউবের দোকান দিয়ে আলাদা হয়ে গেল মানিক। তারপর গতবছর ইলেকশনের পর দোকানটা তুলে দিয়ে মজাপুকুরটার পাড়ের খাসজমিতে কাঠের কারখানাটা দিয়েছে। পার্টির জন্য মারামারি, খুনোখুনি আগের পাঁচ বছরে তো আর কম করেনি। ইলেকশনেও জান দিয়ে খেটেছে। এখনো দরকারে অদরকারে ওদেরই ডাক পড়ে। এইটুকু তার প্রাপ্য ছিল। আর তাছাড়া এই পাড়ায় ওদের বরাবরই চলে। আর কারো মাস্তানির খাওয়া নেই। উঠতি ছেলে ছোকরাগুলো যে ওদের বেশ মান্য করে এইটাও মানিকের একটা জোরের জায়গা।

কারখানাটা চালায়, ভেতরেই একটা ঘর তুলে নিয়ে থাকে আবার পেছনের খাস জমিতেই পাড়ার ছেলেদের নামে তোলা ক্লাবঘরটাতেও রাত কাটায়। নামকাওয়াস্তে ক্লাবঘর। সারাদিন কারখানার কাটাই-চেরাইয়ের ফাঁক-ফোকরে ওরাই চার-পাঁচজনে তাস পেটায়, ক্যারাম টোকে, মাল-টাল খায় অথবা শুকনা টানে। রাতে মেয়েছেলেও চলে। এইবার একটা টিভির বায়না করেছে ওয়ার্ড কমিশনারের কাছে। ব্যাটা আজ দেব, কাল দেব করছে।

টিভিটা ছাড়া ঠিক জমছেনা আসলে। খেলা-টেলাগুলো জুত করে দেখা যেত।

উঠে এক কাত হয়ে থাকা রুস্তমের পাছায় একটা লাথ কষায় মানিক- ওঠ্ শালা!

বিপজ্জনক একটা শব্দ করে নাকডাকাটা থামায় রুস্তম। তারপর চোখ খুলে নড়ে চড়ে উঠে বসে আর সবকিছুর আগে ভূতে পাওয়ার মতো দরজা দিয়ে বেরিয়ে পুকুর পাড়ে গিয়ে হাঁ হয়ে থাকা জিপারটাই

আবার টেনে নামাতে চায়। ঘর থেকে ঝর-র-র শব্দ শোনে মানিক। ব্যাটার ডায়েবেটিক না হয়েই যায়না। অনেকবার বলা হয়েছে। পরীক্ষা করাতে রাজি নয় কিছুতেই। ধরা পড়লেই তো শেষ! - 'সারাজীবন ওগ্‌লা ঝামেলা এক্কেরে পোষাবেনা দোস্‌। তাচ্চে এই ভালো। খালি এট্টু ঘন ঘন ছাত্তে হয় আরকি।'

একটু! এর নাম একটু! মাল পেটে গেলে তো আর কথাই নাই।

ও ব্যাটারও এখন ঝাড়া হাত পা। মা'টা দুবছর হ'ল মরেছে। বউ ভেগেছে আজ তিনমাস। না ভেগে করতোই বা কি! রুস্তমকে দিয়ে আর কিছু হলে তো! রুস্তম এনিয়ে কোনো ঝামেলাও করেনি সেজন্য। পালাবার পর একদিন বলেছিল মানিককে- 'বাচ্চুর সাথে যে মাগীর চিটির পিটির, সেইটা কি আর জানতাম না মনে কচ্ছিস? ভালোই হইসে গেছে। চাইসিলামই তো ভাগুক।' বলে খি খি করে কি হাসি! হলুদ গেঞ্জিটা থেকে তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাওয়া পেটটা কাঁপিয়ে অনেক্ষণ হেসেছিল যেমন, কয়েক টান শুকনার পর কেঁদেছিলও তেমনি। শালা আজিব মাল!

ঘরটায় আরেকবার চোখ বুলিয়ে বাইরে চলে আসে মানিক। কারখানার ছোকরাটার এতক্ষণে চলে আসার কথা। ওর কাছে চাবি দেয়া আছে আর বলা আছে এদিকটায় সেইরকম কোনো দরকার না পড়লে যেন না আসে। নুরু'র ওপর অনেকটাই নির্ভর করে ও। বয়েস কম কিন্তু চালাক চতুর আছে। দৌড়-ঝাঁপ করার ব্যাপারেও কুঁড়েমী নাই। এখন পর্যন্ত উল্টাপাল্টা কিছু দেখেনি সে ছোকরার স্বভাবে। সেইরকম কিছু ধরা পড়লে বরং মানিকেরই মুশকিলে পড়তে হতো। নুরুকে ওর আসলেই দরকার। নইলে সারাদিন বসে বসে দোকানদারি করা ছাড়া উপায় থাকবেনা। এইটা ওরও এক্কেরে পোষাবেনা ।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে রুস্তম পেছনে এসে দাঁড়ায়। ঠিক কানের কাছে এসে একটা হাই তোলে। বাসি দুর্গন্ধ ভক করে নাকে এসে লাগে। সামান্য সরে দাঁড়িয়ে বিতৃষ্ণা নিয়ে মানিক তাকায় ওর দিকে। রুস্তম মুখ ঘষতে ঘসতে বলে,

-'চ'! শিবুর হোটেলের দিক যাই। চা খাওয়া লাগবে।'

কাঠের চেলা দিয়ে ঘেরা কারখানার গেটটা ঠেলে সরিয়ে ভেতরে নুরুর লক্কর ঝক্কর সাইকেলটা দেখে নিয়ে মানিক বলে,

-'আসতেছি। তুই আগা।'

নুরু ক্যাশের হিসাবপত্র নিয়ে বসেছিল। খড়ি নিতে এসেছে একটা লোক। মানিক নুরুর সাথে দু'একটা কথা বলে নিয়ে টুথব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে পায়খানায় ঢোকে। মুখটুখ ধুয়ে তারপর কারখানা থেকে বেরোয়।

রাস্তায় নেমেই শিবু আর রুস্তমকে দেখতে পায় সে। এইদিকেই আসছে।

-' ব্যাপার কি! বাপ ভাগাই দিল্‌?'

ঘাড় ঘুরিয়ে গজ পঞ্চাশেক দুরে মসজিদের মোড়টা একবার দেখে নেয় শিবু,

-'ঝাঁপ ফেলে দিতে হইসে। গন্ডগোল লাগসিলো।

মানিক তেমন একটা অবাক হয়না। বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এইগুলা হরহামেশা হয়। তবে সেজন্য হোটেল বন্ধ করার বিষয়টা মাথায় ঢুকলোনা।

-ঘটনা কী? কী হইসে?'

-'একটা মেয়ে নাকি মরছে ভোরের দিক। দশমাইলের কাছে। ঢাকার বাস থেকে নামছিল। ঐখানেই নাকি পুলিশের কয়েকজন মিলে আগে জবরদস্তি কাম করছে, তারপর ফেলে রাখছে। এখন লোকজন খেপছে আর কি। এইখানেই দুইবার পুলিশের সাথে ঢেলাঢেলি হইল সকাল থেকে।'

রুস্তম বিরক্তি নিয়ে বলে,

-'লাইনের কুনো মেয়েছেলে হবে, বুচ্চিস। পুলিশের তো আর কাম নাই!'
মানিক শিবুর দিকে তাকায়,
- 'পুলিশও তো ঐটাই বলতেছে। কিন্তু মেয়েটার মা ভাই লাশ সনাক্ত করছে। মেয়েটা নাকি খারাপ ছিলোনা। ঢাকায় কাজ করতো। ছুটিতে বাড়ি আসতেছিল।'

মানিক মসজিদের মোড়ের ছাড়া ছাড়া মানুষের জটলাটা দেখছিল। চা টা খাওয়া দরকার। ওদিকেই পা বাড়ায় সে ,
-'চ' তো! দেখে আসি একটু।'
আবার মোড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করে ওরা।

পান আর চায়ের দোকান ছাড়া মোটামুটি বাকি সব বন্ধ। কি কারণে জানি খালি নারায়ণের সেলুনটার হাফ ঝাঁপ তোলা। তিনরাস্তার মোড়ে পুলিশের ভ্যান রাখা। তিনকোনা আইল্যান্ডের ওপর বটপাকুড় গাছটার গোড়ায় গোটাদশেক পুলিশ বসে আছে। রাস্তায় ইটের টুকরার ছড়াছড়ি। ইট মারা লোকগুলো সব এরমধ্যে ভেগেছে অথবা সাবধানে মিশে গেছে এখানে সেখানে। কয়েকজন সাইফুলের স্টিল ফার্নিচারের দোকানের সামনের নর্দমার স্লাবের ওপর দাঁড়িয়ে, কিছু লোক পান সিগারেটের দোকানের সামনে আর বাকি জটলা মন্টু মেকারের রিপেয়ারিং শপটার পাশের চায়ের দোকানটায়।

মানিকরা কালুর টঙের সামনে দাঁড়িয়ে ৩টা চা বলে সিগারেট ধরালো। একই কথা আরো কয়েকজনের মুখে শুনল ঘুরে ফিরে। শিবু যা বলেছিল তার চেয়ে বেশি কিছুই নয়। সুতরাং চা'র সাথে গোল পাউরুটি চুবিয়ে চুবিয়ে খেয়ে কালুর কাছে থেকেই সামান্য আড়ালে তিনটা ছয় ইঞ্চি পকেটে ভরে ফিরতি পথ ধরল ওরা। বেশ একটা হরতাল হরতাল মুড এসে গেছে দিনটায়। তাস পিটিয়ে, ক্যারাম ঠুকে সন্ধ্যাটা পার করে একটা মাগী না আনলেই নয় আজ। রেলবস্তি তুলে দেয়ার পর এখন রাস্তাঘাটে ঘুরছে মেয়েছেলেগুলো। তবে মানিকরা পারতপক্ষে ঐসবে যায়না। মজু মিস্ত্রির ছেড়ে দেয়া বউটা এতদিন করতো, কিছুদিন হলো তার মেয়েটাও লাইনে নেমেছে। বুকপাছা ঠিকমতো ভরার আগেই নেমে পড়েছে। কিন্তু মুখের কাটিং ভালো। প্রথম প্রথম ঘরেই বসাতো, ইদানিং ক্ষ্যাপও মারে। মানিকদের ক্লাবঘরেও গেছে কয়েকবার। যাবার পথে ঐবাসায় একবার দেখা দিয়ে এলো ওরা। আর রুস্তম সেই ফাঁকে মুতেও নিলো।

সারাদিনে মানিকদের এলাকায় আর কিছু ঘটলো না। তবে শহরের কয়েকজায়গায় ভাংচুর, পুলিশের সাথে পাবলিকের ধাওয়া টাওয়ার খবর পাওয়া গেলো।

বিষয়টা অত সহজে শেষ হলোনা তাহলে। শহরের মানুষ এতো ক্ষেপলো কেমন করে সেইটা আশ্চর্য লাগছিল মানিকের। এমনিতে পাড়ায় পাড়ায় হকিস্টিক, চাপাতি, কিরিচ নিয়ে বিভিন্ন ঝামেলায় শো ডাউন, মারামারি তো হয়ই। ওরাও আলুর দলের চ্যাংড়া প্যাংড়াকে কতবার কলোনি পর্যন্ত ঠেঙিয়ে এসেছে। কিন্তু পুলিশ পর্যন্ত ঐসমস্ত গড়ায়না সাধারণত। এইবারের প্যাঁচটা ঠিক ঐরকম না। আলাদা কিছু। এইরকম তো আগে হয় নাই!

পরদিন দুপুরের মধ্যে শহরের পরিস্থিতি পুরোই বদলে গেল। মোতা বিকালের আগে আগে এসে খবর দিলো লাইনের বাস বন্ধ, আজকে আর চলবেনা। প্রচুর ভাঙচুর হয়েছে। পাবলিক খেপেছে খুব। ঘটনার বাদবাকিটাও জানা গেল ওর কাছে। মেয়েটার সর্দারপাড়ার দিকে বাড়ি। সত্যি সত্যিই নাকি ঢাকায় গার্মেন্টসে কাজ করতো। দশ মাইলের কাছে শেষরাতে নেমে বাড়ি ফেরার জন্য ভ্যান ট্যান খুঁজছিল যখন, তখন কয়েকজন কনস্টেবল আর এস আই মিলে সাহায্য করার নামে ওকে ভ্যানে তুলে ইজ্জত নিয়েছে আগে। তারপর হয়তো বেকায়দায় পড়ে মেরে ফেলে রেখে গেছে। পরে আবার ওরাই কথাটা ছড়িয়ে দিয়েছে যে, ও লাইনের মেয়েছেলে। এই নিয়ে এলাকায় ব্যাপক তোলপাড়। তারপর তো কেমন করে জানি পুরা শহরের লোকজনই ক্ষেপে উঠেছে। পুলিশ দেখলেই মারতে যাচ্ছে লোকে।

এরমধ্যে পুলিশের হাতে পাবলিক যেমন লাঠিপেটা হয়েছে তেমনি পুলিশের লোকেরাও খেয়েছে ভালোই। বিডিআর-ও নেমেছে রাস্তায়।

পুরো ঘটনার সাথে কোথাও নিজেদের সম্পৃক্ততা খুঁজে না পেলেও ভেতরে কেমন একটা উত্তেজনা টের পাচ্ছিল মানিক। মারামারির খবরেই বোধায়। রক্তে একটা অস্থিরতা ছড়াচ্ছিল একেকটা নতুন খবর।

শিবুর ডিউটি সকালের সময়টায় থাকে। দুপুরের পর ওর স্কুল ফেরতা ছোটভাই ভাতের হোটেলে বাপকে সঙ্গ দেয়। শিবু তাই দুপুরেই এসে পড়েছিল। রুস্তম কোথায় জানি বেরিয়েছে বারোটার দিকে। মিস্তিরিপাড়ায় ওর বাসাটা এখন খালি থাকে বলে বেশিরভাগ দিন রুস্তম মানিকের কারখানাতে ওর সাথেই থাকে। আগে বর্ডারে হুন্ডির ব্যবসা করেছে কিছুদিন। মরতে মরতে বেঁচেছিল একবার। ছ'মাস হলো ওসবে আর যায়না। এখন বসে বসে টাকা উড়াচ্ছে। ইদানিং ঘ্যান ঘ্যান করতে শুরু করেছে মানিকের সাথে পার্টনারশিপে কিছু করতে চায়। মানিক পাত্তা দিচ্ছেনা। ও জানে রুস্তমের সাথে পার্টনারশিপে যাওয়াটা গাধামী ছাড়া কিছু হবেনা। কোনো দায়িত্ব নেবেনা, শেষে ঝামেলাটা ঠিকই করবে। তাই স্রেফ এড়িয়ে যাচ্ছে সে।

রুস্তম ফিরল বিকেলে। গরম খবরটাও নিয়ে এলো সঙ্গে। লাশ পড়েছে। একটা না, সাত সাতটা পাবলিকের লাশ! টগবগ করে ফুটছিল সে। লাশ না পড়লে কি আর জমে!

ঘটনাটা হলো, দুপুরের দিকেই একটা মিছিল বের করেছিল লোকজন। বিরাট মিছিল নাকি। শহরের মেইন রোডগুলো দিয়ে শ্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছিল ওরা। 'ইয়াসমিনের হত্যাকারীদের ফাঁসি চাই', এর সাথে পুলিশের চামড়া তুলে নিতে চাওয়ার মতো আরো কিছু গরম গরম শ্লোগানের মাঝখানেই পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়েছে, পরে হঠাৎ গোলাগুলি। আর তাতেই মরেছে লোকগুলো। জখমও ম্যালা। শহরের অবস্থা এখন ভয়াবহ। কার্ফ্যু দিতে পারে।

বাইকটা নিয়ে একটা চক্কর দিয়ে আসবে নাকি ভাবছিল মানিক। বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে বাকিদের বিশেষ উৎসাহ দেখা গেলনা। ওদের রেখে শেষমেষ নিজেই বেরুলো। শহরতলির এদিকগুলোয় তেমন একটা কিছু বোঝা না গেলেও রেল স্টেশন থেকে চৌরঙ্গি সিনেমা হলের মোড় পর্যন্ত থমথম করছে শহর। স্পষ্টই বোঝা যায় এই শহরে আজ কিছু একটা হয়েছে। টায়ার জ্বলছে রাস্তার কোথাও কোথাও। গলগলে ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেগুলো থেকে। যানবাহন খুব কম। পুরোপুরি হরতালের অবস্থা। কোনো পলিটিকাল পার্টির ডাকা হরতালেও এতোটা হয়না এখানে। পুলিশ দেখা গেলনা। দুটো ভ্যানের চলে যাওয়া ছাড়া টহল পুলিশের কোনো পাত্তা নাই।

সদর হাসপাতালটা একবার দেখে যাবে কিনা ভেবেও বাইক ঘুরিয়ে ফিরে এলো মানিক।

একটা বেখাপ্পা উত্তেজনা, দুইটা কেরুর বোতল আর অসংখ্য সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে একটা উদ্ভট প্রতিক্রিয়ার রাত কাটালো মানিক, শিবু আর রুস্তম। কাউকে পিটানোর একটা তীব্র ইচ্ছা ভর করছিল মাথায়। একটা পুলিশ পিটানোর ইচ্ছা। দোহাত্তা মাইর! শহরে এত্ত মারামারি হয়ে গেল আর ওরা কিছুই করলো না! একটা পুলিশকেও পিটাইতে পারলো না!

'বালের পাবলিক হইছো তুমি! এইখানে বসে বসে হাত মারো।' -বোতলের সাথে গড়াগড়ি যাওয়া মানিকের কথায় বাকি দুজনেরও মনে হতে লাগল, আহা, সত্যি কতদিন কাউকে পিটানো হয় না! - কত্তদিন জুত করে হাতের সুখ মিটানো হয় না। ওদের হাত-পা-মগজ নিশপিশ করতে লাগলো।

পরদিন বিকেলেই পুলিশ পিটানোর ব্যাপারটা একরকম ফরজ হয়ে দাঁড়ালো। থানা ঘেরাও করে নাকি বিরাট ভাঙচুর হয়ে গেছে। শহরে কার্ফ্যু দেয়া হয়েছে। দেখামাত্র গুলির নির্দেশ। দেশের সব

পেপারে বড় বড় করে খবর ছাপা হয়েছে। অনেক পুলিশের লোক বাসাবাড়ি ছেড়ে ভেগেছে। লুট হয়েছে কোথাও কোথাও। গোটা দেশে ইয়াসমিন নামের মেয়েটাকে নিয়ে এখন বিরাট তোলপাড়।

মানিক, শিবু, রুস্তমেরও এইবার মনে হতে লাগলো শালার ঠোলার বাচ্চারা একটা গরীব মেয়েকে এইরকম করে মেরে ফেললো! হারামীদের ছাল ছাড়ায় নেওয়া না পর্যন্ত শান্তি নাই!

সুতরাং মসজিদের উত্তর দিকের নারকেল গাছওয়ালা দারোগার বাসাটা সহসাই শত্রুদূর্গ মনে হতে লাগলো ওদের। ঠিক তো! কয় মাস হইলো ঐ ব্যাটা আসছে, আসেই বহুত হুজ্জত! ঘুষ খায়ে খায়ে হারামী বিরাট ভুড়ি বানাইছে। বৌ-বেটিরাও মাটিতে হাঁটেনা। গাড়িতে কাচ তুলে দিয়ে যায় আসে। বাইর করতেছি তোর হারামের পয়সায় মৌজ করা!

ওদের তিনজনের মাথাতেই বিভিন্নভাবে একটা কথা ঘুরে ফিরে আসে, হারামীর একটা বেটি আছে না! কাচের আড়ালে গাড়িতে করে দেখার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া আসা করে!

সেদিন সন্ধ্যায় আঁধার নামার পরপরই মসজিদের উত্তর দিকের নারকেল গাছওয়ালা বাসাটায় ডাকাত পড়লো। কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা তিনজন যুবক অস্ত্রের মুখে দারোয়ানকে বেঁধে রেখে ঢুকে পড়লো ভেতরে। দারোগা সেইসময়টায় বাসায় ছিলনা। বেশ একচোট ভাঙচুর করলো তারা। তারপর ভেতর ঘরের দরজা ভেঙে খুঁজে পেল হুইল চেয়ারে বসা আধা প্যারালাইসড দারোগা গিন্নি আর তার সাথে মেয়েটাকে। মহিলার চিৎকারের মুখে তার মুখ বেঁধে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিলো একজন। বাকি দুজন ততক্ষণে মেয়েটার মুখ বেঁধে নিয়ে গেছে বেডরুমে। তারপর তিনজন অস্ত্রধারী যুবকের কয়েকমাসের গোপন ফ্যান্টাসি আর গত দুদিনের ক্রোধের সম্মিলিত উদগীরণ হল মেয়েটির ওপর। প্রায় বেহুঁশ মেয়েটিকে ফেলে আসার সময় আরো কিছু জিনিসের সাথে ড্রইংরুমের কালার টিভিটাও তুলে আনলো ওরা।

... ...

শিবুর মনে হতে থাকে কাজটা খুবই ন্যায্য হয়েছে। শালার বাঞ্চোতেরা বুঝুক মানুষের বৌ-বেটিদের ঐ হাল করলে কেমন লাগে! খালি আপসোস পুলিশ পিটানোর শখটা মিটলোনা।

রুস্তম ভাবছিলো টিভিটা সেট করার জন্য এন্টেনা আর তার কেনা লাগবে কালকে। এইবার বিশ্বকাপটা জমায় দেখা যাবে। ঐ শালার কমিশনারকে আর বাল দিয়েও পুছতে হবেনা।

মানিকের মনে হয় মেয়েটা একবার যেন তার পিঠ খামচে ধরেছিল। চরম সময়ে মেয়েছেলেগুলো যেমন ধরে। বিষয়টা ভাবতেই প্যান্টের ভেতর আবার নড়াচড়া টের পেতে থাকে মানিক।

গাঁজায় দুইটা লম্বা টান দিয়ে চোখ বোঁজে সে।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে, আসল সময়ে প্যান্টের জিপারে চামড়া আটকে যাওয়া নিয়ে রুস্তম যখন খেপাচ্ছে শিবুকে -'শালা আকাটা! বলছিলাম খৎনাটা কর্...', মোতা এসে খবরটা দিলো,
-'দারগার বাসাত নাকি ডাকাতি হইছে। দারোয়ানোক্ বান্ধি রাখি লুটপাট কইর্ছে। বৌটাক পিটাইছে, ফের কাজের বেটিটার অবস্থাও খারাপ কইদ্দিছে। দুইজনায় হসপিটালোত্।'

হাওয়ায় ভাসমান মানিক ধপ করে মাটিতে পড়ে। মূর্খের মতো জিজ্ঞেস করে,
-'কুন্ দারগা?'
-'আরে হামার পাড়ারটায়। ঐ ব্যাটা তো ফের বাচি গেইছে। গাড়িত্ করি বেটিটাক্ বগুড়াত্ নাকি বোহিনের বাড়িত্ রাখি আসিবা গেইছেলো। তাতে এই ঘটনা।'

ক্লাব ঘরটায় হঠাৎ মহাশুন্যের স্তব্ধতা নেমে আসে। একটা টিকটিকিও কোথাও টিক টিক করে ওঠেনা। বাতাসে ক্যাঁচ করে ওঠেনা জানালার কব্জা ভাঙা পাল্লাটা।

সেইসময় মোতা টিভিটা দেখতে পায়,
-আরে! টিভি! দিলি? এই সোমায়!

কোনো জবাব আসেনা।

শিবুর হাতের ফেনসিডিলের ছয় ইঞ্চি শিশিটা ভারি হতে হতে প্রবল ভরবেগে হাত থেকে খসে পড়তে চায়।

মানিকের পেটে দুপুরের ভাতগুলোয় ভয়ানক আলোড়ন ওঠে।

রুস্তমের হঠাৎ বেগ পায় ভীষণ, মনে হয় ওখানেই হয়ে যাবে, বাইরে যাওয়া হবেনা কোনোদিন।

তুই

অনীশ অনেকক্ষণ থেকেই অর্ককে চাপাচাপি করছে - চল, ছাদে যাই। আমি ছিলাম কম্পিউটারে। সেটা শাট ডাউন করে অর্ককে বললাম, চল যাই।

সিঁড়িতে আমি আর অর্ক- দৌড়, দৌড়। কে কার আগে যেতে পারে। আমার সাথে অর্কের জমে ভালো। অনীশের সাথেও জমে, আবার কখনো কখনো অতো না।

ছাদটা একটু অস্বস্তিকর। চারপাশে বাড়িগুলোর বিশ্বাসঘাতকরকমের পাশ ঘেঁষা ছাদ। ড্যাবড্যাবে জানালা-চোখ, ওপাশে একটা সন্দেহজনক মেস।

আমার খুব একটা ছাদে আসা হয় না। ওরা দুই ভাই আসে মাঝেমধ্যে। অনীশ আসে গাছে পানি দিতে।

এখন অবশ্য আশেপাশের ছাদগুলি ফাঁকা। মেসের ছেলেগুলি ফিরে আসেনি ছুটি থেকে, জানালা টানালা বন্ধ। তবু কোনোদিক থেকে সহজে দেখা যায় না এরকম একটা জায়গায় বসে পড়ে আকাশের দিকে তাকালাম। সুন্দর।
'মেঘ যে কত সুন্দর হয় এটা ইদানিং খেয়াল করছি' ঘাড় হেলিয়ে উপরটায় চোখ বুলিয়ে আমি বললাম।
অনীশ একটা কাপড় শুকানোর তার ধরে দাঁড়িয়েছিলো। সে বলল, 'সেটা আমি আর অর্ক আগে থেকেই জানি, তাই না অর্ক?'
আমি চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি। 'মেসটাতো ওইদিকে...এই ছাদে কেউ না থাকলে, এখানে একটা পাটি বিছিয়ে দিব্যি...'
এখনো আলো আছে। হাতের বইটা নিয়ে আসলে দিব্যি পড়া যেত।
'এই ছাদ থেকে দেখাও যাবে না। টাঙ্কিটা আছে না।'
'যাবে, যাবে'

আমি খরখরে মেঝেতে হাত বুলালাম। শুয়ে পড়লে হয়। চুলে ময়লা লাগবে অবশ্য। মরুকগে। ঝুঁটির ব্যান্ডটাকে বালিশ বানিয়ে শুয়েছি। পরনে টপ, স্কার্ট। অনীশটা দুম করে বড় হয়ে পড়েছে। বড়বোনকে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তে দেখে ওর কি অস্বস্তি লাগছে?
অর্কটা এখনো ঠিক আছে। 'বেশ বালিশ তো' বলে আমার পেটে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। হাত দিয়ে মাথাটা একটু ঠেলে সরিয়ে দিলাম।
'ওফ্‌ফ...এইমাত্র কফিটা খেয়েছি ভাই'

'অর্ক দ্যাখ, ওই পাতলা মেঘটা কিন্তু এখানে ছিল না। এখন আবার সরে যাচ্ছে।'
'দেখছিই তো। চলছে যে।'
'আয় গুনি কয় সেকেন্ডে'
'এক...দুই...'

‘তিন...চার...না । আমি যখন আঙ্গুল তুলবো তখন গুনবা’
‘আচ্ছা...পাঁচ...’
‘ছাগল’ অনীশ বলল । রামগরুড়ের ছানা ।

‘.....তিরিশ...সরে গেছে না? কী আস্তে চলে’

আমি শুয়ে শুয়েই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালাম ।
‘অর্ক দ্যাখ ওই মেঘটা । একটা ডায়নোসরের মত দেখতে না?’
‘কই... । কই, না তো? মালগাড়ির মত দেখতে ।’
‘না না ওই যে দ্যাখ, এই মাথা, গলা, এই যে গোল পেট’
‘না, মালগাড়ি । এই যে দ্যাখো ইঞ্জিন, ধোঁয়া ।’
পাশের বাড়ির গাছের পাতাগুলি দুলছে ।
‘অর্ক দ্যাখ, তেঁতুল গাছের পাতাগুলি ক্যামন’
‘এটা কি তেঁতুল গাছ?’
‘তেঁতুল না?’
‘নিম’ অনীশ বলল ।
‘ও, নি-ই-ই-ম । যাই হোক, পাতাগুলি দ্যাখ না । এগুলিকে বলে চিরল বিরল পাতা’
‘চিরল বিরল’

আমি অনীশের দিকে তাকালাম । সরু সরু তার ধরে দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা, আকাশের দিকে চিবুক । বেশ ফোটোগ্রাফিক দৃশ্য ।

‘আমি যা দেখি তুই তা দেখিস?’ অনীশ বলল ।
অর্ক বলল, ‘কী?’
‘আমি দেখি একটা হাঙর’
‘হাঙর?’
আমি গুনগুন করে গান ধরলাম । অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া ।
‘অর্ক বলতো এ গানটা কার লেখা?’
‘ওই যে হাঙর’
‘কই যে?’ আমিও ঘাড় ঘোরালাম
‘ওই’ অনীশ বললো
‘উইইযে ওইটা! পাখনাটা কই?’
‘ভাইয়া, আমি দেখি একটা প্লেন’
‘ওই যে’
আমি একটা মেঘ দেখছি, সিংহের মত ।
‘দ্যাখ, এই মেঘটা, সিংহের মতো, দেখেছিস?’
‘হ্যা, এই যে মাথাটা’
‘দ্যাখ, ওই বিল্ডিংটাতে দিনের বেলাও লাইট জ্বলছে’ অনীশ বললো । আজকে বেশ কথা বলছে গোমড়াপটাশ ।

দূরের বিল্ডিংগুলি নীল, কাঁচ বসানো। এখানে বিল্ডিংগুলি হলদে, নোনাধরা; সবজে সবজে গাছ এখানে। ওইদিকটা পরিচ্ছন্ন, বিষণ্ন, অবাস্তব।
'আর্কিটেকচারে না হবার পর, ওই বিল্ডিংগুলি দেখলে আমার কান্না আসত, একদিন কানলামও তো। আম্মুর সাথে ছাদে আসছিলাম... '
'ছাগল'

আমার পেটের উপর অর্ক বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে; সারাদিন স্কুল, কোচিং, দৌড়াদৌড়ি।

আজান দিচ্ছে।
'তুই নামাজ পড়িস?'
'তুই পড়িস?'
আমি পড়িনা, তাই জবাব দিলাম না। অনীশ পড়ে বোধহয় মাঝে মাঝে। দেখাই হয় না সারাদিনে। দেখা হয় সন্ধ্যাবেলা, তখন দুজনেরই মেজাজ টঙ। ঝগড়াঝাঁটি হ্যান ত্যান।
'দ্যাখ, আকাশে নীলের তিনটা শেড এখন। এদিকে একটা, এইদিকে একটা, আর ওইই দিকে একটা'
অনীশ ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল। 'হুমম'
'নিচে যাবা না?' অর্ক উঠে বসে বলল।
আকাশের একপাশ উজ্জ্বল সোনালী হয়ে উঠছে, অন্যপাশটা এখনো আশ্চর্য একটা হালকা নীল।
অর্ক আর অনীশ পেয়ারা গাছটাতে উঁকিঝুঁকি মারতে গেল। যদি একটা দুটা পাওয়া যায়।
দিগন্তের কাছটা হলদে।
আমরা সিঁড়িঘরে এসে ঢুকলাম আবার। ছাদে তালা দেয়া হল। এখান থেকেই তিনজনের গন্তব্য বিচ্ছিন্ন, ভাবনা চিন্তাও।
অর্ক গেম খেলতে বসল, অনীশ ওর রুমে, আমি আমার রুমে। আবার কোনোদিন ছাদে গিয়ে চেনাশোনাটা ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।

ঘুড়ি-চিল-হাওয়ার গল্প

শেষ বিকেলে ঢাকা শহরে, কোত্থেকে কে জানে, যে অদ্ভুত হাওয়াটা বইতে থাকে তা মানুষের ভীড় ঠেলে, পথের বাস, ক্যাব, প্রাইভেট কার, রিকশায় হোঁচট খেয়ে উঁচু, মাঝারি, নিচু আর সদ্য উঠতে থাকা দালানগুলোর দেয়াল, বারান্দা বা কঙ্কালে ধাক্কা খেতে খেতে ছুঁয়ে ফেলবে অফিস ফেরত বাসের জানালায় ঝিমুনির টাল সামলে অভ্যস্ত হাতে পকেট ঠাহর করা শামীম, ঝুলন্ত বারান্দায় মানিপ্ল্যান্টের তিরতিরে কাঁপুনির সঙ্গে কেঁপে কেঁপে ওঠা শিরিন আর ডিসপেনসারিতে অস্বাভাবিক ধীর গতিতে সরু কাঁচি দিয়ে ট্যাবলেটের পাতা কেটে ওষুধ আলাদা করতে নিবিষ্ট ছেলেটার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকা সুজা কে ।

ধুলো-ধোঁয়া-ইট-কাঠ আর শরীরগুলো ছাড়িয়ে আরো ওপরে তখন হয়তো ঘুড়ির ওড়াউড়ি । পেটকাটি, চাঁদিয়াল, মোমবাতি, বক্কা । অথবা তিনটা চিল, কাছেপিঠের উঁচু গাছগুলোর কোনো কোনোটায় ওরা থাকে, যাদের ডানার সোনালী রং তামাটে হয়ে গেছে ।

শামীমের কোলের অফিস ব্যাগটা ততক্ষণে হাতে উঠে আসবে । পাশের দুই যাত্রীর জড়ো করা পায়ের ফাঁক দিয়ে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে আরো তিন-চারটি নানান আকারের শরীর সরিয়ে, মাড়িয়ে দরজাটার কাছে পৌঁছুনো গেলে তবে শামীম বাম পা-টা নামিয়ে দেবে নিচে । আবার মাটি ছুঁয়ে ফেলার মতো মনে পড়ে যাবে- এখনো 'তার' ফোন আসেনি । আজকের দিনটাতেও নয় । মোবাইল ফোনটা হাতে নিয়ে নতুন জমা হওয়া তিনটা সংক্ষিপ্ত বার্তায় 'হ্যাপি বার্থ ডে' কথাটার রকমফেরে জমতে দেখবে ভিজে ভিজে বিন্দু বিন্দু ঘনীভূত বাষ্পকণা ।
উপলক্ষ খোঁজা আড্ডা থেকে পাওয়া পানের দাওয়াতটাকে তখন ডায়বেটিকের সুগার মাপার মতো বিরস, এড়িয়ে যাওয়ার প্রিয় আলস্য মাখা কিছু মনে হতে থাকবে ।
আর তখনই ধোঁয়া আর বাষ্পের জালে জড়ানো বিপন্ন পা-দুটোকে একহাতে লাঠি নিয়ে ফুর-র-র শব্দের বাঁশির ভাষায় ট্রাফিক পুলিশ জানিয়ে দেবে - ফুটপাথ দিয়ে ঘুরে যান ।
আরো কিছু আকার-প্রকারের শরীর বাঁচিয়ে শামীম যখন ওভার ব্রিজের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ওপরের জমাট ভিড়টাকে মডার্ন টাইমস ছবির ভেড়ার পালের সাথে মেলাবে, শিরিন তখনো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ।

নিচের গলিপথের দৃশ্যমান শেষ বাঁকটা পর্যন্ত সরে সরে যাওয়া রোদের শেষ চিহ্ন হারিয়ে শীতল অন্ধকার নামতে দেখার অপেক্ষায় নয়তো ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সবটুকু দিয়ে পালিয়ে যাওয়া ঘেমো গন্ধটার সামান্যতম আনবিক অস্তিত্ব খুঁজতে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকা শিরিনের শরীরে সীমাহীন অস্থির পীড়ন, ক্রোধ কিংবা গোপন রোমন্থন সুখ ।
কিন্তু ভেতর ঘরের দুধসাদা টাইলসের মেঝেতে পিছলানো তেলতেলে আলো, অ্যান্টিক নকশার আসনের গদীময় পেলবতা, চক্রাকার শতরঞ্চির আদিবাসী মোটিফ আর বহু বিচিত্র শো-পিসের সযত্ন বিন্যাসের মধ্যে দেয়ালে ঝুলন্ত ফর্সা, লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য আর মাথাভরা চুলের পরিপাটি সুদর্শন পুরুষটির ফ্রেমবন্দী অবয়ব থেকে শিশুর গায়ের মত বার্লি বার্লি গন্ধ বেরিয়ে এসে যখন ভরতে থাকবে প্রতিটি বর্গফুট জায়গা,

বাথরুমে গিয়ে বমি করে ফেলবে শিরিন। গলায় আঙুল দিয়ে বের করে দিতে চাইবে গন্ধটার প্রতিটি কণা, ছ'মাস ধরে যা জমছে একটু একটু করে।
এরপর ডানহাতের তেলো থেকে মাদক টানার মত নাক টেনে টেনে খুঁজতে থাকবে ঘাম আর পোড়া তামাকের মিশেল গন্ধটার এতটুকু অবশেষ। শুঁকতে শুঁকতে দাঁত বসিয়ে দেবে এক সময় - চামড়া, মাংস কেটে বসতে থাকবে শ্বদন্ত - রক্তের লবণ স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যগ্র বাঘিনীর মতো।

তখন ফর্সা-সাদাটে-বার্লি গন্ধের শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে সরিয়ে শক্ত, বাদামী, ঘেমো শরীরটা নির্মাণের রোমাঞ্চে তির তির করে আপাদমস্তক কেঁপে উঠবে শিরিন। খরখরে চিবুক থেকে বুকের উন্মুখ বোতাম ঘরের পথ ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসবে উরুসন্ধির উত্থানে...

হাওয়াটা গলিপথের দালানটায় বারকয়েক ঘুরপাক খেয়ে ঠিক সেসময় আবার ঢুকে পড়বে ব্যালকনিতে। মানিপ্ল্যান্টের কমবয়সী পাতাগুলোর ভেতর আটকা পড়ে ডানা ঝাপটাতে থাকবে প্রচন্ড। আর পাতাগুলোর মতই শিরিন কেঁপে উঠবে প্রবল তাড়নায় থরথর করে।
দাঁত কেটে বসা চামড়া আর মাংস ছিঁড়ে ছিটকে বেরুবে রক্ত, গড়িয়ে যাবে- উষ্ণ, চটচটে।

গড়িয়ে পড়া সুখের সাথে ধ্বস্ত শিরিন যখন শাওয়ারের নব ঘোরাবে, ওষুধের দোকানে দাঁড়ানো সুজার প্রথমবারের মত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে তখন। 'পুরা পাতাই দাও, আর কাটা লাগবে না'- কথাটা শুনে আরেকপাশে বসা মাঝবয়সী দোকানমালিক কাজে ঢিলেমীর জন্য ছোকরাকে ধমক লাগিয়ে ক্ষমা চাওয়ার চোখে তাকাবেন।
ওষুধ হাতে বেরিয়ে রাস্তার চৌকো দোকানে সিগারেট ধরিয়ে ফুসফুসে নেওয়া ধোঁয়ার উষ্ণতা যখন ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে ফেলবে স্নায়ুতে, বিভ্রান্তি আর বেদনাবোধের বিপরীতমুখী দুটো স্রোত তখন ফের ফুঁসে উঠবে সুজার ধমনীর ভেতর। বুকের সবচেয়ে ওপরের বোতাম ঘরটার অস্বস্তিকর শূণ্যতায় হাত বুলিয়ে সুজার উপলব্ধি জন্মাবে -ও বাসায় যাওয়াটা ঠিক হয়নি মোটে।

ছ'মাসের জমিয়ে তোলা প্রতিরোধ ভেঙে ফেলার ছুঁতোটায় আকস্মিক ধাক্কার তোড়ে বিপজ্জনক বালখিল্যতা দেখতে শুরু করবে সুজা। অপ্রত্যাশিত অসম্ভাবনার উৎকট মোকাবিলায় জগৎটাকে একটা বিচিত্র সার্কাসের তাঁবু মনে হতে থাকবে তার - নিজেকে মুখে রঙমাখা পরিচয়হীন ভাঁড়। সংযত প্রত্যয়ের ছ'টি মাসে মাঝে মাঝে উঁকি দেয়া কৌতুহলটাকেই শেষপর্যন্ত জ্ঞানবৃক্ষের ফল ঠাউরে বিগত ছ'মাসের এলোমেলো পুনর্পাঠ আর নীতির ধারে কাটাছেঁড়া করবে যখন, গোধূলির শেষ আলোর আকাশ গুটিয়ে নামতে থাকা ঘুড়ির সুতোয় সুতোয় তখন কাটাকুটির টান। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছতে মুছতে ওড়ার কক্ষপথের ঘের কমিয়ে আনা চিলের ডানায় শহরের উত্তাপে হালকা হয়ে ওপরে উঠতে থাকা হাওয়ার ঝাপটা।

সুজার মনে পড়বে ওষুধের সাথে ইসবগুলের ভূষি নিতে ভুলে গেছে সে, বাবার কোষ্ঠকাঠিন্যের নিয়মিত পথ্য। ফিরতি পায়ে আবার দোকানের দিকে হাঁটবে যখন, তখনই ইসবগুলের ভূষির চিত্রকল্পে সাদৃশ্যের সূত্রপথে বার্লির বেপরোয়া প্রিয় সঘ্রাণ অনুপ্রবেশ, সেই সঙ্গে তীব্র চোরা যন্ত্রনার দ্বৈরথে অভিভূত সুজা নিদারুণ ছ'টা মাসের আল টপকে পেছনের আটটি বসন্তের দিকে হাঁটতে শুরু করবে।

শিরিন জামা বদলে ড্রায়ারে চুল শুকিয়ে তখন ফের ব্যালকনিতে । হিমের কাঁপন শরীরে ।

সুতো গুটিয়ে ঘুড়িগুলো নাবতে নাবতে কোথাও একটা ভোকাট্টা শোনা যাবে হয়তো - চাঁদিয়াল, পেটকাটি, বক্কা - কোন্‌টা কে বলতে পারে ।

হিম হিম অন্ধকার নামবে শহরে, পথে, বৃক্ষশাখায়, ঘরের কোণে কোণে ।

চার তলার ফ্ল্যাটের সিঁড়িভাঙা পাদুটোকে অন্যায্যরকম ভারী মনে হতে থাকবে শামীমের, সিঁড়িগুলোকে বেখাপ্পারকমের খাড়া ।
দিনমান তীব্র অপেক্ষার স্নায়বিক অবসাদে ঘরে ফেরা শামীমের কাছে এরপর আর জন্মদিনে এমনকি শিরিনেরও উইশ না করা বা আদৌ মনে না রাখার বিষয়টিকে বেসুরো, অমার্জিত মনে হবেনা ।

তবু খেতে বসে যখন অদূরে রাখা রূপোলি কাগজে মোড়া চ্যাপ্টা চৌকো একটা প্যাকেট দেখিয়ে জিজ্ঞাসার সুরে শিরিন জানাবে সুজা এসেছিল বিকেলে, শামীমের হাতের চামচটা থেকে অনেকটা মাংসের ঝোল ছলকে পড়বে জামায় । খাবার রেখে দ্রুত বাথরুমের দিকে উঠে যাওয়া শামীম পেছনে রেখে যাবে তার উদ্‌ভ্রান্ত বিমূর্ত একটা দৃষ্টি - আর কিছুটা পরিচিত গন্ধ ।

বিকার, নির্বিকার

ভীষণ বাথরুম পাচ্ছে। জ্যোতি বেশ কিছুক্ষণ বালিশে মুখ চেপে শুয়ে রইল।

ঝিরিঝিরি শাওয়ার

টাইলস

ভেজা শাওয়ার ট্রে ।

সেদিন দুপুর, সেদিন দোতলার সিঁড়ি

ও উঠছিল, বুড়ো নামছিলো ।

ধাক্কাটা একদমই ইচ্ছাকৃত। বুড়ো কুত্তা ।

ধুত্ অন্য কোনো চিন্তা ।

ধুত্ ।

উঠতেই হল।

গিয়ে প্রথমে বাথরুমের লাইট জ্বাললো।
বন্ধ দরজার নিচ দিয়ে সরু আলোর রেখা। শেষবার ও নিজেই শক্ত করে দরজা টেনে দিয়েছে। এখন মনে হচ্ছে খোলা থাকলেই ভালো হ'ত। প্রচুর আলো হ'ত ঘরে এখন। জ্যোতি ফিরে গিয়ে টিউবলাইট জ্বালিয়ে দিয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল। ভারী কাঠের পাল্লা সরে গেল নিঃশব্দে। বুকটা ধ্বক করে উঠেছে। নাহ্ কেউ নেই। মেঝেটা হালকা ভেজা, খালি।
দূর সম্পর্কের এক খালা এসে থাকে এখানে জ্যোতির সাথে। ওর ইচ্ছাটা যদিও ছিল একলা থাকার। এই প্রথম এত দূরে পোস্টিং। মা কিছুতেই রাজী হল না। আর ওরও পুরোপুরি সাহসে কুলায়নি, আগে কখনো একা কোথাও থাকে নি তো। কিন্তু, খালা দেশে যাওয়ার পর ভীতু খুকির মত দৌড়ে বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করল না। দিন পনেরো বেশ বড়ত্ব দেখানো। এখন দুদিনের মাথাতেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। ছুটিটাও যদি এসময় টাইফয়েড না বাঁধাতো। মাকে ডাকতেও হত না তাহলে। বরং 'আর কবে বড় হবো' জাতীয় রাগারাগি করা যেত দিব্যি।
একলাটাই বেশি খারাপ লাগে।

শূন্য আলোকিত বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে ও ডান বুকে হাত বুলাল। ভালো লাগে। মনে বল আসে। আত্মবিশ্বাসও। এসব তো লেগেই আছে পৃথিবীতে। ধাক্কা খাওয়া। বুকে, পিঠে, পেছনে, কাঁধে দুর্ঘটনাবশতঃ হাতের চাপ...শেষে একটা 'সরি' বা কিচ্ছু হয়নি ধাঁচের উপেক্ষা...বাথরুমের সামনে দাঁড়িয়ে জ্যোতির দুকাঁধ ঠান্ডা হয়ে উঠল, কানে গরম হলকা, গালেও। ঘাম। কী বিশ্রী ভয় জিনিসটা।
দিনের বেলা এসব অবাস্তব লাগে। বাড়িতেও ফোন করে নিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা মেলাবার অনেক পরে বই ছেড়ে উঠল। বারান্দায় হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর ঘরে ঢুকতেই...ছায়া ছায়া। গম্ভীর। সবগুলি ঘরের লাইট জ্বালিয়ে দিল জ্যোতি । বাথরুমের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সাবধানে দরজা খুলে ভিতরে উঁকি দিল। অন্ধকার। কেউ নেই।
শোবার আগে আবার বাসায় ফোন করল জ্যোতি । বিছানায় শুয়ে ছটফট করল ঘুমাবার আগ পর্যন্ত।
আজকেও অফিসে বিশ্রী ক্যাশিয়ার ভদ্রলোক...। কিছু না, শুধু অকারণ ত্যালত্যালে হাসিটা। লোকটা কি নিজেকে আমার সমান ভাবে নাকি। ওর পিত্তি জ্বলে গেল।

আজকাল রিকশা ওয়ালা, পানওয়ালা, এমনকি ভিক্ষা না দিলে ফকিররাও...একটা চাহনি দিয়ে কতকিছু ছিনতাই করে নিয়ে যায়। কী অপমান।
সেদিনও পাশের বাড়ির বুড়োটা...।
আরেকদিন, ইউনিফর্ম পরা, ছুটির সমান একটা ছেলে এসে ... ।
শুয়ে থাকলেই এসব চিন্তা ভেসে আসে। একলা বলেই বোধহয়। তা-ও ভালো শাওয়ার ট্রেটার কথা...। ধুত্, আবার মনে পড়ে গেল। সকালে অফিস যেতে হবে...সকালে
...সকালে একটা ডিমভাজি, পাউরুটি...ঝিরঝিরে শাওয়ার...শাওয়ার কার্টনে জলের ছিটে...

পরদিন অফিসে গেল মনে বিরক্তি নিয়ে। তার পরদিনও। তার পরের দিন ঘুমের ওষুধ খেতে হ'ল। ঘুম থেকে উঠল উস্কখুস্ক খসখসে মুখে। ভেজা টাইলস। সেদিন দুপুর। সেদিন দুপুর দোতলার সিঁড়ি। ও উঠছিল, বুড়ো নামছিল। ধাক্কাটা একদমই ইচ্ছাকৃত বুড়ো কুত্তা। ধুত্ অন্য কোনো চিন্তা। ধুত্।

একলা অমিশুক একটা মেয়ে। একটা একলা অ্যাপার্টমেন্ট। কেউ কাউকে চেনে না। একদিন হঠাৎ পুলিশে সয়লাব। মেয়েটার শাওয়ার ট্রে তে দাঁত খিঁচিয়ে পড়ে আছে একটা মরা বুড়ো...ফালতু সিনেমা একটা।
দেখেছিল ছাড়াছাড়া ভাবে। মুখ ধুয়ে ক্রিম মেখে ঘুমিয়েও গিয়েছিল। অনেক অনেক রাতে...গভীর ঘুমের মধ্যে মনে হল...মনে হল চরিত্রটা ঠিক আমার মত। অমিশুক, সঙ্গহীন, নিরানন্দ...একলা...বাথরুমের কাঠের দরজা, শাওয়ার ট্রে-তে একটা মরা দাঁড়কাক...ঘুমের মধ্যে চামড়া গড়িয়ে ঘাম নামল।

অফিসে পাঁচটা পর্যন্ত থাকা যায়। সাড়ে পাঁচটার আগেই সব খালি। এখন বাসায় ফিরতে ভালো লাগেনা। একটা বাবা থাকলে বিয়ে হয়ে যেতে পারত এতোদিনে। ছুটির জ্বর সারেনি। সিঁড়িতেই বিতৃষ্ণা লাগতে থাকে। তালা খুলে বাসায় ঢোকা-বিরক্তিকর। ঢুকেই চোখ পড়বে বাথরুমের দরজার দিকে। তারপর দরজা খুলে ভেতরে তাকাতেই হয়। আগেই জানতাম, খালি।

পরদিন সকালে চোখ খুলে মনে হল...মনে হল আমি অফিসে না গেলে কেউ বাসায় ঢুকতে পারবে না; বাথরুমে রেখে আসতে পারবে না একটা...ধুত্। খালাটা পালিয়েছে আসলে।

অনেক জোরে জোরে শব্দ করে নাশতা বানিয়ে খেল ও। ধাম করে দরজা লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামল ঠকঠক করে। দোতলার দরজা বন্ধ। একতলা বরাবরের মত খালি। খালি বাড়ি।

রাতে খেয়ে দেয়ে টিভির সামনে বসে থাকা।
টিভিটা অন্ততঃ কথা বলে। নৈঃশব্দের একটা আলাদা টেনশন আছে। আজকাল ও নিজেও তাই মাঝে মধ্যে একটু একটু কথা বলে। গলার স্বরটা শোনা। কিন্তু কী বলবে ভেবে পায় না। এসব হালকাপনা ওর মধ্যে কম। মাঝেমধ্যে শুধু বলে, ধুর, নেই নেই। নেই তো রে বাবা। এর চেয়ে গান গাওয়া অনেক সোজা। তাই গুনগুন করে গান গায়। বাসনপত্র নাড়ে শব্দ করে। মাঝে মধ্যে পেছনে ফিরে দেখাটা থামাতে পারে না। সদর দরজাটা কি বন্ধ করা হয়েছিল? মাঝে মাঝে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তায় তাকায়। চারপাশে কত মানুষ। ভয়ের কিছু নেই।
চেনা, অর্ধচেনা সবাইকে গত কয়েকদিনে ফোন করা হয়ে গেছে। সময় পার করা। এখন আর ফোন করার কেউ নেইও। শামুকের মত শুয়ে আছে একই জায়গায় ফোনটা। কালকে সকালেই দোতলার বউটার সাথে আলাপ করে আসব।
পরদিন অফিসে ওর এই কথাটাই বারবার মনে হল। দোতলায় গিয়ে আলাপ করে আসব। বউটার সাথে দুয়েকদিন চোখাচোখি হয়েছে। পাশের ফ্ল্যাটে একটা মেয়েটেয়ে তাকলে ভালো হত। রিটায়ার্ড ম্যাজিস্ট্রেট না জাজ যেন থাকে ছোট একটা কাজের ছেলে নিয়ে। ভদ্রলোকের ছেলে বোধহয় মেরিনার, ছেলে জাহাজে চলে গেলে বউও চলে যায় বাপের বাড়ী। জ্যোতি মাত্র এক আধবার দেখেছে।
বাসায় ফিরবার পর আলসি লাগতে থাকে। দোতলার বউটা একটু কেমন যেন। ও নিজেও তেমন মিশতে টিশতে পারেনা মানুষের সাথে। দেখা করে কী বলবে?
না, না, না, বোকা...কেউ নেই ওখানে, না, না, নেই...ডিম সেদ্ধ দিয়ে জ্যোতি বসে বসে আঙ্গুল দিয়ে টেবিলে ঠক ঠক শব্দ করে। বিশ্বাস না হলে দেখে এসো গিয়ে, কেউই নেই। ডিম সেদ্ধ হয়ে গিয়ে পাতিলে ঠোক্কর মারে। আহ, শব্দ!
বাসাটা যদি বড় রাস্তার ওপরে হত, কত কথা শোনা যেত চারপাশ থেকে। এমন সময়ে বাচ্চাদের পড়া মুখস্থের সুর পাওয়া যেত। জ্যোতি উঠে গিয়ে বাথরুমটা দেখে নিল একবার, কেউ নেই।
পরদিন সে আফিসে গেল না। না ঘুমিয়ে না ঘুমিয়ে চোখ বসে গেছে। আজকে সারা সকাল আর দুপুর আর বিকাল ঘুমিয়ে কাটাল। ঘুম ভাঙল যখন, বাসি, ঠান্ডা ঠান্ডা সন্ধ্যা। ওহ, আ-বা-র অন্ধকার। কেন যে! উঠে গিয়ে বালতির উপর কল ছেড়ে দিল ও। প্রচন্ড জোরে পানি পড়ছে। যদি একটা ক্যাসেট প্লেয়ার থাকত। টিভি ছেড়ে দিল ও। টিভি জিনিসটা বেশ ভুতুড়ে। একা একা বকবক করে যাচ্ছে। কারো সাথে কারো সম্পর্ক নেই।

পরদিনও ও অফিসে গেল না। মা'র সাথে কথা বলা, যায়? আবোল তাবোল ডায়াল করে কানে ঠেকালো ও। ওপাশ থেকে 'হ্যালো?' 'হ্যালো?' 'আমি...' সে মুখ ফুটে বলতে পারল না। 'আমার বাথরুমে ...' ঠোঁট ফাঁক করল, বলতে পারল না। উঠে গিয়ে বাথরুমটা দেখে নিল একবার। এখনো খালি, কেউ নেই।

পরদিনও ও অফিসে গেল না।

পরদিনও ও অফিসে গেল না।

ঘুম ভেঙে দেখে রাত। বা সন্ধ্যা। বা গভীর রাত। আজকে কি বার? উঠে গিয়ে বাথরুমটা দেখে নিল । পুরো খালি। আশ্চর্য ।

পরদিনও ও অফিসে গেল না।

দূরের শহরে ওর কিছু আত্মীয়স্বজন আছে। কিন্তু অনেক দূরে। কয়েকবার বাথরুমে উঁকি দিল ও। বারান্দায় গেল। ফিরে এলো । আলোয় কেমন যেন অবাস্তব লাগে; অন্ধকারে লাগে ভয়। চা শেষ হয়ে গেছে। ঘুমের ওষুধ? শেষ। পিপাসা পেয়েছে? কিছু করার না পেয়ে আবার এসে শুয়ে রইল। কেউ যদি এসে ওর বাথরুমের দরজাটা খোলে; কাঠের দরজা গড়িয়ে সরে যাবে, কিন্তু...কেউই নেই।

মনটা একদম ফাঁকা হয়ে আছে। যেন আদি সমুদ্রের তীরে প্রথম একলা জেলিফিশ... আমার একটা খালি শাওয়ার ট্রে আছে। বাথরুমের দরজাটা ঠেলে সরিয়ে দিলে। শাওয়ার ট্রে। খালি। কিছু নেই। আমার শাওয়ার ট্রে খালি। পাশের ফ্ল্যাটে একটা নোংরা বুড়ো আছে।
জ্যোতি বিছানায় কুঁকড়ে মুকড়ে শুয়ে রইল। আমার শাওয়ার ট্রে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন কেউ যদি আসে, যদি কেউ। দরজাটা ঠেলে সরিয়ে দিলে, আমার শাওয়ার ট্রেতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে...

একটা বুড়ো দাঁড়কাক...

মরা...এখন আছে।

বিদায় মেঘনীল, অথবা পারমিতা

বিদায় মেঘনীল । অথবা পারমিতা ।

সেন্ট ফিলিপ্‌সের গীর্জার ঘন্টার ঢং ঢং আওয়াজটা মিশন রোডের দেয়ালগুলোয় ধাক্কা খেয়ে দূরাগত হতে হতে পেছনের তুঁত বাগানের ঘন সবুজ অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগে যে বিষাদ মাখিয়ে যেত আমাদের পাড়ার ঘর-বারান্দাগুলোয়, আর পড়া ভুলে একটুক্ষণ বয়সের চেয়ে বেমানান উদাসী চোখে আমরা বিদায়ী আলোর আকাশটা দেখে নিতাম - 'বিদায়' বলতেই গত জন্মের স্মৃতির মতো সেই মুহূর্তটা ফিরে এলো । আর কিছু নয় ।

অথচ সহজ ছিল উত্তরের খোলা বারান্দার মাধবীলতার ঝাড় দুলে ওঠা, পাঁড় রোমান্টিকের মতো চড়ুইগুলো ফুর ফুরর উড়তে শুরু করতো, পাশের ইট সিমেন্টের নির্মাণযজ্ঞ ফুঁড়ে সন্ধ্যের লোড শেডিং বিরতির পাহাড়ি বাঁশিটা বেজে উঠতে পারতো ব্যাকগ্রাউন্ডে । আর শের শাহ্ সুরি রোড থেকে আদাবর ১০ পর্যন্ত বিভিন্ন দৃশ্যাবলী গলে গলে পরস্পরে মিশতে থাকতো দালির পেইন্টিং-এর মতো ।

আমি তখন যাদুকরের হ্যাটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে থাকতাম ।
হাতড়ে বের করে আনতাম ছ'টা চড়ুই । খুঁটে খুঁটে ভাত খেতে থাকতো ওরা রোদের চৌকো নকশা কাটা বারান্দায় - রব্বানির জন্য রাঁধা ভাতের থেকে । সদর দরজার কাছ থেকে অফিস ব্যাগটা হাত বদল করে রব্বানীর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকানো পর্যন্ত রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আবার আলাদা করতে শুরু করতাম ছ'জনকে । একজনের গলার কাছে পালক ঘন, আরেকজনের খয়েরির শেড কিছু গাঢ় । ছিপছিপে গড়ন একজনের ।

ওদের আমি চিনে নিতে শুরু করি । নিচতলায় চুলোর ধারে যেদুজন মানুষ রান্না করছে, ভার্সিটিতে যাওয়ার আগে চুলে শ্যাম্পু করছে যে মেয়েটি, নাস্তার টেবিলে বাচ্চাদের জুতো পরাতে পরাতে চা-এর জন্য অপেক্ষা করছেন যিনি এবং টিভির সামনে অনির্দিষ্ট চোখে জুবুথুবু বসে আছেন যে বৃদ্ধ - তাদেরও ।
চা হাতে ডাইনিং টেবিলের দিকে যাওয়া জা-এর নিরাবেগ দৃষ্টি বিনিময়ের মাঝে চা-এর উত্তাপ পৌঁছে দিই বৃদ্ধের ধোঁয়াটে দৃষ্টিপথের নিচু টেবিলে । অশ্রুত রেফারির বাঁশি বেজে ওঠে । আর দিনমান শুরু হওয়া সংসারের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক খেলায় শরিক হয়ে যাই রোজকার মতন, যেখানে স্বাবলম্বী রোজগেরে ছেলের বাপ-মায়ের মতের তোয়াক্কা না করে বিধর্মী বন্ধুর বোনকে বিয়ে করে ঘরে তোলার অখুশি চেপে যাওয়ার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াগুলোর দাবি ন্যায্যত প্রকট হয়ে ওঠে আমার চারপাশে । আর গত আড়াই মাসে আমি রূপান্তরিত হতে থাকি বৃক্ষের মতো আপাত অযোগাযোগীয় ।

ননদ ভার্সিটিতে, ভাসুর অফিসে আর বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলের জন্য জা এর বেরিয়ে যাওয়ার পর শের শাহ্ সুরি রোডের দুই পুরুষ পুরনো দোতলা বাড়ির বন্ধ হওয়া দরজার এপাশে শ্বাশুড়ি, শ্বশুর আর আমার চেয়েও দৃশ্যমান হতে থাকে আড়াই মাসের জমে ওঠা গাঢ় নিরুত্তাপ একটা গাম্ভীর্য ।

উত্তরের বারান্দায় মাধবীলতার ঝাড়টা তখন রোদ মেখে বেতের চেয়ারজুড়ে ঢেলে দিচ্ছে ক্যালাইডোস্কোপিক নকশা ।

চতুর্থ মাসে তাই রব্বানী যখন হঠাৎই ভাড়া বাসায় আলাদা হয়ে যাবার সিদ্ধান্ত জানায়, যাদুকরের হ্যাটের ভেতর ঢুকে পড়ে শুধু ছ'টা চড়ুই সহ উত্তরের বারান্দা আর মাধবীলতা ।

সেরাতে রব্বানীর ভর বুকে গভীরে ডুবতে ডুবতে আমি নাভিমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠি - তবে আমাকেও চিনে নিতে চেয়েছে কেউ । বৃক্ষ থেকে চড়ুই হয়ে উঠি আমি - নির্লজ্জ ক্রীড়াময় ।

শের শাহ্ সুরি রোড থেকে আদাবর ১০ এর কুড়ি মিনিটের পথ সেদিন প্রসারিত হতে হতে আমায় দাদার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় -

'দ্যাখ্, বন্ধুর সুন্দরী বোনের সাথে প্রেম করতে চাইবার লোকের তো আর অভাব হয়না । কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা নেয়ার জন্য একটা মরাল গাট্স লাগে- যেখানে ধর্ম আলাদা হওয়াটাও একটা বিষয় । এই জায়গাতেই রব্বানীর প্রস্তাবটা আমার ভালো লেগেছে । এখন বাকিটা তোর ওপর । তোর পছন্দ হলে মা'কে আমি ম্যানেজ করে নেব ।'

রসিকতা করে দাদা -'আর দুজনের নামেও কেমন মিল বল্, সর্বাণী-রব্বানী!'

দাদার বন্ধুদের ভেতর দেখতে ভালো, ভদ্র, হালকা রসিকতায় না থাকা, সাথে রীতিমত একটা সম্মানের চাকরি আর দাদার সার্টিফিকেট সহ আপাদমস্তক রব্বানীকে অপছন্দ করার আর কোনো কারণ থাকেনা । বাবা থাকলে ব্যাপারটা কেমন হ'ত জানিনা, মা'র সম্মতি আর রব্বানীর বাসার লোকদের অন্তর্গত বোঝাপড়ার সৌজন্যের মাঝে আমাদের বিয়েটা রেজিস্ট্রি হয়ে যায় ।

সবটুকু মঙ্গল চেতনা জড়ো করে যা কিছু অনিশ্চয়তার ভাবনা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিই সেদিন । শিমুল তুলোর শরীর নিয়ে এই পথেই বুঝি সে উড়ে গেছে মহাশূণ্যের ওপারে - আদাবর ১০-এর পাটকিলে রঙের পাঁচতলা বাসাটার ছাদের ওপর দিয়েই ।

২

রোদের উঁকিঝুঁকি ঢেকে দিচ্ছে গা ঘেঁষে উঠতে থাকা দালান, মাধবীলতা নয়, বরং দিনমান নির্মাণের ধুলোর ঢেউ খেলে যায় ঘর-বারান্দাময়, তবু এ বাসারই পঞ্চম তলার মেঝে থেকে ছাদ, বারান্দা থেকে সিঁড়ির ল্যান্ডিং পর্যন্ত আমার সংসারের সুরটি বেজে ওঠে- এই প্রথম ।

প্রথম অতিথি হয়ে মা আসে একদিন । ফিরে যায় প্রসন্নতা আর আমার অনুযোগ নিয়ে-'বিয়ের পর দাদা একবারও এলোনা ।'

তবে আমার অপেক্ষা থাকে বিশেষত শ্বাশুড়ি আর জা এর জন্য - এসে দেখুন আমার সংসারের নিপাট পরিপাট্য, দুহাতে জড়ো করা সহজ সচ্ছন্দ সুখ ।

রব্বানীর সাথে পরামর্শ করে এক শুক্রবার শের শাহ্ সুরি রোডের বাসাটাকে নিমন্ত্রণ করে আসি । ঘরের শেষ ধুলিকণাটি পর্যন্ত মুছে ফেলতে আমার সযত্ন তৎপরতার মাঝখানেই আগের রাতে ওবাড়ি থেকে ফোন আসে, যেন রান্না বান্না না করে ফেলি, অযথা নষ্ট হবে- বিভিন্ন কাজের ঝামেলায় ওদের কেউ আসতে পারছেন না । তবে অবশ্য রিংকু এসে ঘুরে যাবে বিকেলে ।

একটা চড়ুই যদি সেদিন কোনো ফাঁক গলে এসে ঢুকতো এবাসায়, আমি নিঃসংশয়ে ধরে নিতাম ও ছ'য়েরই একজন ।

প্রাইভেট ভার্সিটি পড়ুয়া ননদের সাথে বয়সের পার্থক্য বছর তিনেক মাত্র হলেও আলাপ তেমন জমেনি ওবাসায় । নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত দূরে দূরে থাকা রিংকুর সাথে আজ কথা হয় । ঘুরে ঘুরে বাসা দেখে রিংকু, আর আমি তার চোখে দেখি নির্ভেজাল মুগ্ধতা -'বাসাটা সুন্দর ভাবি! শান্তি শান্তি!'

নুড্লস রাঁধতে রাঁধতে রিংকুর মনোযোগ দিয়ে ড্রেসিং টেবিলে চুড়ি, পারফিউম ঘাঁটা দেখি ।

- 'ভাবি, তোমার সিঁদুর কই? পরোনা ।'

ও বাড়ির রান্না ঘরে বলক ওঠা গরম পানিতে চা পাতা ঢালতে ঢালতে বলা জা'র কথাটা মনে পড়ে যায়-'তুমি তো দেখছি সিঁদুর টিদুর পরোনা,না? চুল উঠে টুঠে যায় বোধায় । তোমার মা'র দেখলাম- সিঁথির চুল সব উঠে ঠকঠক ।'

-'আমি তো পরি না ।'

ফ্রিজ থেকে সসের শিশি বের করতে করতে ননদের প্রশ্নের জবাব দিই ।

- 'কেন? আমার তো বেশ লাগে দেখতে?'

- 'নুড্লস-এ শশা খাও তো?'

রান্না ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ জানায় রিংকু ।

- 'তুমি যে ঘরটায় থাকতে ওটা আগে আমার ছিল জানো । ছোটভাইয়া থাকতো নিচ তলায় । একটু খারাপ লাগসিলো তোমরা দখল করায় । বারান্দাটা খুব প্রিয় ছিল তো ।'

আমি শশা কেটে প্লেটে সাজিয়ে হেসে বলি,

-'এখন তো আবার তোমার হয়ে গেল!'

ছোট্ট গোল ডাইনিং টেবিলে খাবারটা সাজিয়ে ননদকে বসতে ইশারা করি ।

প্লেটে সস ঢেলে হাতে করে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় সে ।

- 'আর কি? সামনের মাস থেকেই তো আর নাই । বড়ভাইয়াও বাসা দেখতেসে ।'

আমি অবাক হই ।

-নাই মানে?

- 'ছোটভাইয়া বলেনি তোমাকে? ডেভলপারের সাথে কথাবার্তা তো আগেই হয়ে গেস্‌লো। সামনে মাস থেকেই ওরা বাসা ভাঙা শুরু করবে। বড়ভাইয়া বাসা পেলে তো আমরাও ভাড়া বাসায়। কনস্ট্রাকশন হয়ে গেলে আবার একসাথে। অবশ্য আলাদা আলাদা ফ্ল্যাটে।'

ভালোলাগার একটা ইট খসার শব্দ শুনি।
কথাটা রব্বানী বলার প্রয়োজন মনে করেনি!

৩

ক্রমশ আমার উপন্যাস পড়া দুপুরের ভাবালুতায় একটা একটা গিঁট পড়ে, সন্ধ্যাগুলোয় জাতিস্মরের স্মৃতি, ক্ষীণ প্রতিধ্বনিময় হতে থাকে হরিণের খুরের শব্দে নামা রাত। সংসার অতঃপর আটপৌরে ছক কেটে এগোয় ।

ছুটির দিনগুলোয় রব্বানীর ছটফট করার অন্তর্গত চাপটা একটু একটু করে দৃশ্যমান হতে থাকে। রিংকু মাঝে মাঝে আসে। শাশুড়ি, জা বা ভাসুর আসেননা। যৌথ পরিবারের সংঘ ভাঙার অদৃশ্য হুলিয়া নিয়ে ফিরি আমি।

এক বিকেলে বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলা খোঁজ খবর নিতে আসেন। আমার নাম শুনে তার কপালের তিনটা ভাঁজ স্পষ্ট হয়, চোখে দুটো প্রশ্নবোধক চিহ্ন পড়ি। পরদিনই আসেন নিচতলার ভাড়াটে মহিলা। একই গল্পের পুনর্পাঠ হয়।

রাতে রব্বানীর সাথে আলাপে প্রসঙ্গটা উঠলে রব্বানীর প্রতিক্রিয়া আমাকে প্রথমবারের মতো মাটিতে নামিয়ে আনে,

-'তোমার নামটাই আসলে সেকেলে। আজকালকার নামগুলো তো বেশ সেক্যুলার হয়, শুনে কিছু বোঝা যায়না। ছোট করে বাণী ডাকলেও একই সমস্যা।'

মুখে ক্রিম ঘষা হাতটা থেমে যায় আমার,

-'সমস্যা!'

হাঁটুর ওপর ল্যাপটপ রেখে বিছানায় আধশোয়া রব্বানীর দিকে ভালো করে তাকাই।

-'সমস্যাটা কি সেকেলে বলে, না সেক্যুলার নয় বলে?'

স্ক্রিনের থেকে চোখ না সরিয়েই রব্বানী ভারি কণ্ঠে জবাব দেয়,

-'লোকজনের বাড়তি আগ্রহটা বিরক্তিকর, সেইটা মিন করেছি। নামে সমস্যা হবে কেন?'

শিমুল তুলোয় কুয়াশার জলকণা জমে।

আমি কথা খুঁজে পাইনা। আর কিছু নয়, শুধু একটা যুক্তি অথবা প্রশ্নই সামনে দেখতে পাই, বিয়ের সিদ্ধান্তটা যখন নেয়া হয়েছিল, লোকের বাড়তি আগ্রহের মতো এবং তার চেয়েও গুরুতর বিষয়গুলোর সাথে কি তখনই ফয়সালা করে নেওয়া হয়নি।

নৈঃশব্দের ভারি বাতাসটাকে দূরে সরাতে চেয়ে লঘু স্বরে বলি,

-'তোমার নামটা ছোট করলেও কিন্তু বানী হয়!'

ল্যাপটপের আলোতেও গাঢ় ছায়াময় রব্বানীর মুখের রেখায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখিনা।

-'আচ্ছা, তোমার ফার্স্ট নেমটা ধরে ডাকলে কেমন হয় বলো তো? গোলাম!'

আমার হি হি করে হেসে ওঠার মাঝখানে বাজ পড়ে হঠাৎ। ল্যাপটপটা সশব্দে বন্ধ করে ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে রব্বানী,

-'ইডিয়টের মতো কথা বোলোনা! সবকিছুর একটা সীমা থাকে!'

আমার হতভম্ব চোখের সামনে দিয়ে রব্বানী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আমি বিভ্রান্ত হয়ে বসে থাকি ।

বাইরের ঘরে টিভি ছাড়ার শব্দ শুনি আর অভিমানে ভারি হতে হতে প্রবল নিম্নমুখী টানে গুটিয়ে গিয়ে ভাবতে থাকি, রাগ অথবা অপমানের কতটুকু ন্যায্যত রব্বানীর হওয়ার কথা ছিল।

একঘন্টা, দু'ঘন্টা কিংবা তারো বেশি সময় পার করে ঘরে আসে রব্বানী। বিছানায় আমার আড়ষ্ট শরীরটাকে জাগিয়ে তুলতে তুলতে ফিস ফিস করে বলে,

-'ঐ নামটা ধরে আসলে স্কুলে, কলেজে ক্ষ্যাপাতো আমাকে। তাই হঠাৎ মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। তুমি রাগ করে আছো?'

ভেতরে ভেতরে আমি আবার বৃক্ষ হতে থাকি। টের পাই রব্বানীর ফিসফিসে কথাগুলো সরীসৃপের মতো আমায় জড়িয়ে ধরে উঠছে।

৪

ফ্ল্যাটের বাকি সংসারগুলির মতোই আমার সংসারও উলের দুটো কাঁটার মতন মিষ্টি তেতোয় একটা পরিচিত প্যাটার্ন বুনে চলে।

এমন সময় আমার সদ্য গাঁথা শেকড় নাড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় পুরুষের আবির্ভাব।

শ্বশুরবাড়ি থেকে যোগাযোগ না রাখাটাকে যখন একরকম মেনে নিয়েছি, সেইরকম সময়ে একদিন হঠাৎ জা এলেন, কিছু না জানিয়েই। সঙ্গে বাচ্চাদুটো। আমি তখন গুনগুন করতে করতে চারুলতার চারুর মতো বেশ ঘরোয়া সুখের ছবি সাজিয়ে বসে ট্রেসিং পেপার থেকে সোফার রুমালে ফুল তুলছি। বাচ্চাদুটোর পরনে স্কুলের ইউনিফর্ম, চোখে মুখে ক্লান্তি। ওদের খেতে দেবার ব্যস্ততা থেকে নিরস্ত করে জা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসেন,

-'রতন তোমার কেউ হয় নাকি?'

-'কে রতন?'

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি উপেক্ষা করে তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেন তিনি। ওঁর বাড়ি ফেরার তাড়ার মুখে অস্বস্তিকর কৌতুহল নিয়েই সংক্ষিপ্ত আতিথেয়তা শেষ করতে হয়।

সেদিন নিয়মমতো সন্ধ্যের লোড শেডিংটা প্রায় সঙ্গে নিয়ে রব্বানী বাসায় ফিরলে রতন বিষয়ক জিজ্ঞাসাটার কথা ওকে জানাই। ওর ভ্রুর কুঞ্চনে বিরক্তি ঘন হয়। কিন্তু জবাবের বদলে জিজ্ঞাসা আসে,

- 'আম্মা আসেনি?'

কৌতুহলটাকে আটকে বলি,

- 'ভাবি বাচ্চাদের স্কুল থেকে নেয়ার পথে ঢুকেছিল। আমি বলেছি, মাকে যেন নিয়ে আসে। আরেকদিন দাওয়াত করে আসি, নাকি বলো?'

রব্বানী এই প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে সন্ধানী চোখে চারপাশটা দেখে।

-'ধূপ জ্বালিয়েছো নাকি?'

-'হুঁ। বিকেলে জ্বালিয়েছিলাম। মশা হয়েছে।'

-'কয়েল নাই ঘরে?'

চার্জার লাইটটা হাতে নিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয় রব্বানী।

একঘর অন্ধকারের মাঝে ঠিক তখনই পাহাড়ি সুরের বাঁশিটা ঢুকে পড়ে, ফেনিয়ে তোলা বিষাদের শূণ্যতা পুরতে থাকে কোনায় কোনায়।

বিকেলে বুড়ি ঠিকে ঝি-টাও ধূপের গন্ধ পেয়ে বলেছিল, পূজা পূজা গন্ধ লাগে গো!

আমার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় দৃশ্যাবলী। অথবা আমি ওদের ছাড়িয়ে এগুতে থাকি। রিকশার চাকার প্রতি আবর্তে এইসব পথে পথে ছাড়তে থাকি মায়াবী আঁঠালো বাকল আর ছেলেবেলায় রিকশার দুলুনিতে প্রতিবার মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়ার মতো ঘুম নামে সর্বসৃজুড়ে। রাস্তাটা তবু শেষ হয়না আজ। আকাশ জোড়া মেঘ।

-'আমরা এসে গেছি মা?'
-'এইতো...আর অল্প ।'
-'আমার ভাল্লাগেনা ওখানে । পিংকি আমার চুল টেনে দেয়, কাকি ওকে বকেনা ।'
-'তুই আমার কাছে কাছে থাকিস । ঠাকুমাকে দেখেই আমরা চলে আসব ।'
-'ঠাকুমাও আমাকে আদর করেনা মা...কথাই বলেনা ।'
-'উনি তো অসুস্থ, তাই বলেন না । ডাক্তারের বারণ ।'
-'কাকির সাথে যে বলে । পিংকির সাথে যে বলে । খালি তোমার আর আমার সাথে বলেনা!'
-'সুস্থ হলেই বলবে । বেশি কথা বলা বারণ তো ।'
-'কোন্আইসক্রিম কখন কিনে দেবে?'
-ফেরার সময় । এখানে আসার কথা বাবাকে বলতে পারবিনা, মনে আছে তো?'
-'হুঁ । বাবাকে বললে কি হয় মা?'
-'রাগ করবে ।'
-'কেন? ঠাকুমা তো বাবার মা হন, না?'
-'হুঁ ।'
-'ঠাকুমা বাবার সাথেও কথা বলেনা?'
-'অত কথা বলেনা বুড়ি । চুপ করে বসে থাকো ।'

রতন যে কে, সেদিন জানা হয়না আমার । রিংকু এরপর যেদিন আসে, একবার ভাবি ওকে জিজ্ঞেস করব । ভেতর থেকে ঠিক মা বলে ওঠে-'চুপ করে বসে থাকো বুড়ি' ।

৫

সেইদিনটা একটা বিশেষ দিন ছিল। গভীরে, অনেক গভীরে অন্যরকম উত্তেজনা আবিষ্কারের দিন, গোপন সুখের রিনরিনে অনুভূতির দিন।

অন্তত রিংকুর আসার আগ্ পর্যন্ত।

রিংকু এলো ভীষণ বৈপরীত্য নিয়ে।

বিকেলবেলা ভাঁজ ভাঙা নতুন পাঞ্জাবি পরা, দাড়ি গোঁফে ঢাকা মুখের কিছু রোগা, লম্বা একটা ছেলেকে সাথে করে এলো রিংকু, ওর চেহারায় চিন্তার ছাপ স্পষ্ট পড়া যায়।

এই প্রথম রিংকুকে আমি শাড়িতে দেখি। বিষয়টা বুঝে উঠতে উঠতেই রিংকু ছেলেটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়,

-'ভাবি, ও রতন। আমরা একটু আগে বিয়ে করেছি।'

কি বলব ভেবে কুলোতে না পেরে যখন দুজনকে আরেকবার মিলিয়ে দেখছি, রিংকু আমার হাত ধরে ভেতরের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে নিচু স্বরে বলে,

-'মা-বড় ভাই বিয়েটা মেনে নিত না। ওরা রতনের ব্যাপারটা জানে। ওকে কারো পছন্দ নয় ভাবি। রতন হিন্দু। তাই আমাদের আর উপায় ছিলনা।'

অনেকটা অস্বস্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করি,

-'কিন্তু এখন কী করবে? বাসায়...'

-'আমরা এখন ওদের গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। সপ্তাখানেক থাকব। এরমধ্যে একটু ঠান্ডা হোক। তুমি ছোট ভাইয়াকে একটু বুঝিয়ো ভাবি। বিয়েটা তো হয়েই গেছে। এখন পুলিশ, টুলিশ এইরকম কোনো ঝামেলা যেন না করে। তোমার কাছে ভাবি এইজন্যই আসা।'

-'ওদের গ্রামের বাড়িটা কোথায়?'

প্রশ্নটা যেন শুনতে পায়নি এমন ব্যস্ততায় আবার বাইরে চলে আসে রিংকু। এতক্ষণে খেয়াল করি ওদের সাথে মাঝারি সাইজের একটা ট্রাভেল ব্যাগ। ওটা তুলে একটু শুকনো হেসে রিংকু 'দোআ কোরো' বলে দরজার বাইরে পা বাড়ায়। অপ্রস্তুত একটা সালামের মতো ভঙ্গি করে ছেলেটাও পিছু পিছু বেরিয়ে যায়।

দরজা বন্ধ করে ভাবনাশূন্য মনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। রব্বানীকে ফোন দিই । সবটা শুনে একটুক্ষণ চুপ থেকে একই প্রশ্ন করে সেও,

-'গ্রামের বাড়িটা কোথায়?'

বলে যায়নি শুনে 'ঠিকাছে' বলে ফোনটা রেখে দেয়।

করণীয় কী বুঝে উঠতে না পেরে একধরণের উৎকণ্ঠা নিয়ে রব্বানীর বাসায় ফেরার অপেক্ষা করতে থাকি। সেদিন সন্ধ্যার বাঁশিটায় বিষাদের রস ঘনিয়ে ওঠেনা। একটা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হতে থাকে। আজকের দিনটা ঠিক এইরকম হওয়ার কথা ছিলনা।

অপেক্ষার সময়গুলোর অস্বাভাবিক প্রসারণে সন্ধ্যা মাড়িয়ে রাত নামে। দশটার দিকে রব্বানীকে ফোন দিই এবং সে বার বার কেটে দিলে শেষে ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনির্দিষ্ট ভাবনায় ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি নিজেকে।

খাবারগুলো ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করতে নিয়ে যাই । কাজের ভেতর অস্থিরতা চাপা দেয়ার চেষ্টা করি ।

অবশেষে পৌনে বারোটায় ডোরবেল বাজে ।

সেদিনের গাম্ভীর্যে অন্য একটা কিছু, ফর্সা মুখটায় গাঢ় অচেনা অভিব্যক্তি - পড়ার চেষ্টা করতে করতে জিজ্ঞেস করি,

-'ওবাসায় গেস্‌লে? কী হ'ল?'

রব্বানী জবাব না দিয়ে কাপড় ছাড়তে থাকে । টেবিলে খাবার সাজিয়ে ওর বাথরুম থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি । বেরুলে খেতে ডাকি । ভারি কণ্ঠে জবাব আসে,

-'খেয়ে এসেছি ।'

আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ।

-'কী হয়েছে বলবে তো? দু'বার ফোন দিলাম ধরলেনা । আমি না খেয়ে বসে আছি ।'

সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে ছাদ কাঁপিয়ে একটা হুঙ্কার দেয় রব্বানী,

-'বোঝোনা কী হয়েছে? ফোন ধরিনি বলে আদিখ্যেতা করার সময় এটা?'

অপমানে জমে যাই ।

-'কী হচ্ছে তোমার চেয়ে ভালো জানেটা কে,অ্যাঁ? বাসার সবাই ভাবছে তোমার প্রশ্রয়ে হয়েছে সব । তোমার জন্য বাপ-মায়ের কাছে এইবার আর মুখ দেখানোর উপায় থাকলো না ।'

আমি অসহায়ের মতো বলি,

-'আমি কী করলাম?'

-'কী করেছো? তুমি আগে থেকে জানতে না এইসব? রিংকু তোমার কাছে আসতো এমনি এমনি?'

অবলম্বনহীন বিপন্ন লাগে নিজেকে ।

-'রিংকু কোনোদিন এই ব্যাপারে কিছু বলেনি, বিশ্বাস করো । ছেলেটাকে আমি আজকের আগে চিনতামনা পর্যন্ত ।'

-'চিনতে না যে জানি । আমি খোঁজ নিয়েছি । হারামজাদা রিংকুর ভার্সিটিতে পড়ত ।'

কথাটা কানে লাগে হঠাৎ । বিপন্ন স্রোতে ভাসমান পা দুটো যেন শক্ত কিছুতে হোঁচট খায় । মরিয়া একটা কণ্ঠ বেরিয়ে আসে ভেতর থেকে,

-'খোঁজ নিয়েছো? তুমিও... ভেবেছিলে ছেলেটা আমার পরিচিত? আর এই...এই সবের পেছনে আমার হাত?'

রব্বানীর কণ্ঠ এতটুকু নরম হয়না,

-'ভাবাটা অন্যায় হয়েছে নাকি? যে কেউ ভাববে । একই ফ্যামিলিতে দু-দুটো এরকম ঘটনা! আমার মাথায় আসেনা কীভাবে সম্ভব । আমারটা মেনে নিয়েছে তাইতো বেশি । কিন্তু ঘরের মেয়ে ... ছি! ... '

ভাঙনের পাড়ে দাঁড়ানো গাছের মতো মাটি কামড়ে থাকার আকুল চেষ্টা করতে করতে কেমন যেন বুঝতে শুরু করি স্রেফ অস্তিত্বহীন একটা কিছু দুহাতে আঁকড়ে ধরতে চেয়ে আমি ক্রমশ নিজেকে হারিয়ে ফেলছি, বাপ-মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে 'না' করে দিয়ে ছেলের নিজের পছন্দে অসবর্ণে বিয়ে করা মানতে না পারা আমার বাবার পরিবারের মানুষগুলোর সমস্ত প্রত্যাখ্যান আর অবহেলা উপেক্ষা করে দীর্ঘ ব্যর্থ চেষ্টায় হারিয়ে যাওয়া আমার মা'র মতোই । মা'র পাশে তবু বাবা ছিলেন আজীবন । আমার পাশে শুধু হাঁ করে থাকা একটা গভীর খাদের শূন্যতা দেখতে পাই ।

কতকগুলো পোষ মানা অনুভূতিতে বিদ্রোহ টের পেতে থাকি হঠাৎ ।

রব্বানীর চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলি,

-'আমাদের বিয়েটা তোমার জন্য এখন লজ্জা পাওয়ার মতো একটা ঘটনা?'

রব্বানীর চোখে বিভ্রান্তির আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়,

-'আমাদের চৌদ্দগুষ্টিতে কেউ অন্যধর্মে বিয়ে করেনি! আমি করেছি। কেন? ঐসব ফালতু জিনিস আমি মানিনা বলে। তার জন্য তো আর পরিবার পরিজন অস্বীকার করতে পারিনা, নাকি! তিন তিনটা মাস সময় পেয়েছো তুমি। একটা মানুষেরও মন জয় করতে পারলে না। চেষ্টাই করোনি! অথচ এই...এইটা তোমার নিজের গরজে করার কথা ছিল না? ফ্যামিলি বন্ডিং কাকে বলে বোঝো? নিজেকে নিয়েই তো ব্যস্ত সবসময়!'

খাদের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে বিমূঢ় হতে হতে অবশেষে আমি নিজের কণ্ঠস্বরটা খুঁজে নিই।

-'চেষ্টা আমি করেছি রব্বানী। আর গরজটা শুধু আমার কেন হবে? তোমার কোনো দায়িত্ব ছিলনা? আমাকে বিয়ের ডিসিশন নেয়ার আগে এসব ভাবোনি? বিয়েটা কি আমার অপরাধ? তোমার উচিৎ ছিলনা, এইরকম একটা পরিস্থিতিতে আমার মনের অবস্থাটা বোঝা? আমাকে সাপোর্ট দেয়া ? হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে বন্ধুদের কাছে খুব প্রগ্রেসিভ সাজতে চেয়েছিলে। সেটার দায়িত্ব নেবার বেলায় আসল চেহারাটা বেরিয়ে গেলো, না! আসলে... তুমি একটা হিপোক্রেট!'

রব্বানীর প্রচন্ড জোরে কষানো চড়ে টাল খেয়ে পড়তে পড়তে দুহাতে চেষ্ট অব ড্রয়ারটা ধরে ফেলি আমি। ডান গালের অস্তিত্ব ফিরে পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। নোনা স্বাদ বলে দেয় ভেতরে কোথাও কেটে গেছে। রব্বানী আরো কিছু বলে, বলতে বলতে বেরিয়ে যায়। আমি কানে আর কিছু শুনিনা। ভোঁ ভোঁ অন্ধকারে একটা ব্ল্যাকহোল আমায় টেনে নিতে থাকে ক্রমশ- শব্দ, বর্ণহীন নিরেট অন্ধকারে। ঐ অন্ধকারের ভেতর মাধবীলতার ফুল তোলা আমার রুমালগুলো বেড়াল হয়ে যেতে থাকে। আর তাদের নরম থাবার আড়ালে লুকানো নখ বের করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে থাকে চড়ুইগুলোকে।

৬

বৃষ্টি নামে ভীষণ। ঘন ছায়ায় ঢাকা চরাচর বর্ণহীন হতে হতে স্বচ্ছ ধূসর পর্দায় দুলে দুলে ওঠে। শ্যাওলা সবুজ আধাবাস্তব জলের ভেতর থেকে ভুস করে মাথা তুলি আমি প্রবল বর্ষণময় জমাট আকাশের নিচে। আমার হাড় পর্যন্ত কেঁপে ওঠে।

মা হয়তো এরপরও বলেছিল-'চুপ করে থাকো'। দাদা বোঝাতে চেয়েছিল,'সংসারে ওরকম একটু আধটু হয়ই। ঐ পরিস্থিতিতে রব্বানী মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। নইলে ও তেমন মন্দ ছেলে নয় রে!'

অথবা মা কিছুই না বলে বরাবরের মতো হয়তো নিজেই চুপ মেরে গেছে। আর বিয়ে-থা সংসার কিংবা ক্যারিয়ার না বোঝা দিনবদলের ভারি ভারি স্বপ্ন দেখা আমার দাদা অপরাধীর মতো মুখ লুকিয়েছে।

আমি এসব কিছুই মনে রাখতে চাইনি।

আমি বরং বৃষ্টিতে নেমেছি। একশহর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সুলতানার নার্সিং হোমের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছি,

'বিদায় মেঘনীল, অথবা পারমিতা।
তুমি যেই হও, তোমার জন্য বেছে রাখা নামদুটো যত সেক্যুলারই হোক না কেন; এই তুমুল বৃষ্টি, বিদায়ী আলোর আকাশ, নকশা কাটা রোদের সকাল আর হারিয়ে যাওয়া পাখিদের শহরে তোমায় নামিয়ে আনার সাহস আমার নেই।'

ব্যবচ্ছেদ

যে দিন আমার দরজার চাবির ফুটোটা একটা লাল স্কচটেপ দিয়ে বন্ধ করে দিলাম - জাহিদ খাবার টেবিলে বসে দেখছিল - ওখান কে চেঁচিয়ে বলল, 'এটা আবার কি?' আমিও বললাম, 'যাতে কেউ চাবির ফুটা দিয়ে দেখতে না পারে সেজন্য'। তাকিয়ে রইল, যেন খুবই অবাক হয়েছে। ভানের চূড়ান্ত। এতটা আমাকে দিয়ে হয় না; আমি চুপ করে রইলাম। অন্ততঃ সে বুঝেছে যে আমি বুঝে গেছি। তার পরও অবশ্য শেষ দানটা দিতে ছাড়ল না 'ওহ! আবার সেই...?' একটা ভ্রু উঁচিয়ে, আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দেবার জন্য।

পরদিনই আত্মীয়স্বজন জনে জনে চাউর হয়ে গেল। ফোন করে করে সবাইকে বলেছে। দ্যাখো দ্যাখো আমার বউ পাগল, তোমরা কেউ ওর কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না। যেমন বাপের মেয়ে!
শেষেরটা অবশ্য সত্যি। আমার বাবার খানিকটা ছিলো, সন্দেহবাতিক। আমার বিয়ের বহু আগেই ওসব চুকে বুকে গেছে। তবে সবাই জানে। এসব জিনিস কখনো চাপা থাকে না। জাহিদকে একটু একটু আমি নিজেই বলেছিলাম, বিয়ের পরপর, বোধহয় সহানুভূতির লোভে। বাকি হাবিজাবিগুলি হয়ত আমার স্কুলের ডায়েরি ঘেঁটে জেনেছে। পারতেও পারে, আমার ঘরের ড্রয়ারেই তো সব থাকে। ক্লাস নিতে যাবার সময় আমি তালা দিয়ে যাই। কিন্তু ডুপ্লিকেট চাবি জোগাড় করা তো আর কঠিন কিছু না। ওদের অফিসেই একটা কাঠমিস্ত্রি আছে, তালা চাবির কাজ করে। অথবা আমার মায়ের কাছ থেকে শুনেছে, খুব তো খাতির।

যাই হোক, যেভাবেই জানুক, ওর খুব সুবিধা হয়েছে। প্রায়ই আকার ইঙ্গিতে বলার চেষ্টা করে। আজকাল আমি ঘরে থাকলে এক মুহূর্ত চোখ বোঁজে না। ওর কান্ডকারখানায় সুস্থ লোকও পাগল হয়ে যাবে, আমি বলে টিকে আছি। যেমন ছোরা ছুরির ব্যাপারটা। আমাকে কখনো ছুরি ধরতে দেবে না; কাঁচিও না, ব্লেডও না। আমি ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটতে পছন্দ করি, অথচ ও আমার ঘরে পেলেই লুকিয়ে ফেলে। প্রায় সময়ই খুঁজে পাই না। তখন আরেকটা কিনে আনতে হয়। তারপর যেমন কেরোসিনের বোতল। দেশলাই তো নেইই, চুলা অটো-ইগনিশন। কিন্তু আঁকতে গেলে তুলি মুছতে কেরোসিন লাগে। একটু একটু করে আনাতে হয় আমার, বেশি করে কিনে আনতে পারিনা। তাছাড়া, বোতলেও প্রায়ই কম পাই। নিশ্চয়ই ফেলে দেয়। ডুপ্লিকেটটা অনেক খুঁজে দেখেছি, পাই না। ওর ঘরেরটা আমি একটা ক্যানভাসের পেছনে সেলোটেপ দিয়ে আটকে রাখি। আমি বাইরে গেলে সব হাঁটকে পাটকে দেখে নিশ্চয়ই। একবার একটা ছুরি কিনে এনে রেখেছিলাম, মজা দেখার জন্য। পরদিনই গায়েব! ছুরি দিয়ে আমি ওকে মারতে পারবো নাকি? ওর গায়ে যা জোর! রাগ উঠলে আমাকেই ধাক্কিয়ে ফেলে দেয় এই দেয়াল থেকে ওই দেয়াল। ওর বান্ধবীদের কথা যখন বলা শুরু করি; বিশেষ করে ভাবীর কথা উঠলে তো মোষের মত ফোঁস ফোঁস করে।
অথচ নিজে আমাকে সারাক্ষণ নজরদারি করে যাচ্ছে।

একদিন সকালে জানালা দিয়ে দেখলাম, একটা লোক বসে আছে ফুটপাথে। বিনা কাজে। সারাদিন বসে রইল। পরদিনই আমি জানালার পর্দা পালটে দিলাম, গাঢ় খয়েরি। ও যথেষ্ট বিরক্ত হল, বলল, পর্দা পাল্টাচ্ছো কেন? বললাম, নিজের পয়সায় পাল্টাচ্ছি। সেদিন থেকে দেখি লোকটা আর নেই।

ঘরের দরজা লাগিয়ে রাখলে বিরক্ত হয়, ফোন করার সময় আশে পাশে ঘুরঘুর করে; ভার্সিটি যাবার সময় বলে, চলো, পৌঁছে দিই। রাজি না হলে চোখ সরু করে বলবে, 'কেন, গাড়িতে যেতে সমস্যাটা কি?'
আমি ইংল্যান্ডে গেলে কী ভাবে নজর রাখে কে জানে? ওখানেও কি লোক রাখে? হতে পারে, ওর এক কাজিন আছে ওখানে। নিজে এদিকে কাটা ঘুড়ির মত লটরপটর করে বেড়াবে আবার বউকেও নজরে রাখবে। বাহ! ও কি ভাবে, আমি জানিনা? প্রত্যেকটা মানুষ জানে, এমনকি ইউনিভার্সিটিতে আমার কলিগ থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রীরাও। অনেকেই বলাবলি করে। আমি নিজে বেশ কয়েকবার শুনে ফেলেছি।

সরাসরি আজকাল ওকে আর বলিটলি না, তাহলে ধরে পাগলাগারদেই পাঠিয়ে দেবে হয়ত! চেষ্টার তো কমতি করে না।। প্রায়ই খুবই বন্ধুর মত বলে, চলো না একজন ডাক্তারের কাছে। সায়কায়াট্রিস্ট তো আসলে কাউন্সেলার...। হয়ত একসময় পাগল প্রমাণ করে ছাড়বেও। বাংলাদেশে ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করা কি কঠিন কিছু? আমার নিজের মা-ভাইকে পর্যন্ত বুঝিয়ে ফেলল। মাঝে মাঝে এমন প্রেশারের মধ্যে ফেলে, মনে হয় সত্যিই পাগল হয়ে যাব।

একসাথে ওবাড়িতে গেলে, সবাই সবাইকে চোখ দিয়ে নানা রকম ইশারা করবে। পাগল সাবধান! ভাবীর সাথে তো কথাই বলে না। আমার সামনে সুমনার নাম মুখে নেয় না। আমি আর কি করব, এসব দেখি, আর ভাবি।

এখানে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। পাশের বাড়ির বুড়িটা কেমন অদ্ভুত চোখে যে আমার দিকে তাকায়। আমি যখন ইংল্যান্ডে ছিলাম, তখন নিশ্চয়ই দেখেছে অনেক কিছু। যদি একবারে পিএইচডি-টা করে আসতে পারতাম, চিন্তা ছিলো না। আবার যখন যাবো, এবাড়ীতে মচ্ছব বসে যাবে। কী করব? একবার ভেবেছিলাম, যাবোই না। কিন্তু, গোপনে গোপনে ও সায়কায়াট্রিস্টের সাথে দেখা করেছে, আমি তো আমার সূত্রমতে জেনেছি। খাবার টাবারে ওষুধ মিশিয়ে দিচ্ছে কি না কে জানে? চারদিক থেকে যেন চেপে ধরেছে আমাকে। আমার পক্ষে কি ওর সাথে এঁটে ওঠা সম্ভব? ছুরি টুরি ও তালা দিয়ে রাখে। বালিশে চেপে, গায়ের জোরে পারব না। ল্যাব থেকে কিছু জোগাড় করতে হবে, বা, গ্যাস। এখনো দুমাস দেরী আছে, জানি না কি হয়।

বোঝাপড়া

কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়েছিল মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গেছে। তিনদিক থেকে আসা রিকশা এবং গাড়ি এবং যা কিছু জীবন্ত সেইসময়টায় স্থিরচিত্র হয়ে গিয়েছিল। সময়ের হিসেবে সেকেন্ডের ভগ্নাংশমাত্র।

হুডতোলা রিকশাটা পাশ কাটাতে পেরেছিল। ইট বোঝাই ট্রাকটা সে জায়গা পায়নি। জায়গা ছিলনা আমারও।

এরপর দ্রুত ফিরে আসে চলচ্চিত্র, শব্দের ঝাঁক আর লোনা স্বাদ। রক্তের । সময় এরপর স্থির।

আমাকে ঘিরে অনেকগুলো ভয়ার্ত, উৎসুক মুখের ভিড় জমে যায়। এই মুখগুলোর কেউ আমার সামাজিক সম্পর্কের নেটওয়ার্কের ভেতরে নেই। তবু এদের আমি চিনি। রোজ বাসের লাইনে, কাঁচা বাজারে অথবা ওভার ব্রিজ পারাপারে এদের সাথেই আমার দেখা হয়। আমিও তাদের অবচেতনে একই ভাবে চিহ্নিত, জানি।

বিশেষত্বহীন, নামহীন মুখগুলো আমায় ভালোভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়ে যায় আজ।

আমার ঈষৎ বিস্ফারিত চোখও তাকিয়ে দেখতে থাকে মুখগুলোকে। তার ফোকর দিয়ে ইস্পাত রঙা আকাশ, আর একটা দিক আড়াল করা আকাশ-ছোঁয়া বিশাল এলইডি স্ক্রিনটাও।

টের পাই বাঁদিকের পকেটে হাত গলে গেছে কারো। ওখান থেকে পাঁচ টাকার একটা কয়েন আর মোবাইল সেট বেরুবার কথা। ওদুটো নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে দ্রুত।

পেছনের পকেটেও কারো আঙুল ঢুকে পড়েছে। ওটা থেকে বেরুবে আমার মানিব্যাগ। হয়ত তার থেকে আমার পরিচয়ও। সবুজ রঙের প্রেসকার্ডে কালো হরফে লেখা থেকে জানা যাবে আমার সাংবাদিক পরিচয়।

পরিচয়ের হাত পা গজাবে। কেউ উদ্যোগী হয়ে ফোন করবে অফিসে। ছুটে আসবে জাহিদ, আদেল অথবা ওমর ভাই। খবর যাবে বাড়িতে।

অতি আশাবাদী হচ্ছি কি?

মানিব্যাগ তোলা আঙুলগুলো টাকাকটা টেনে বের করে কাছের নর্দমায় ফেলে দিতে পারে ব্যাগটার অবশিষ্ট। পিচকালো অর্ধতরল বর্জ্যের চোরাবালিতে ডুবতে থাকবে ব্যাগটি, কালো রঙেরই। তার ভেতরে ডুবে থাকা সবুজ প্রেসকার্ডে আমার পরিচয়ও।

আমি দেখতে থাকি । মুখগুলোর রেখাচিত্র, ধাতব আকাশ, এলইডি স্ক্রিন।

ট্রাকটা কাজ সেরে দেরি করেনি। করেনা সাধারণত। পাশ কাটাতে গিয়ে রিকশাটা হেলে পড়েছিল একদিকে। আরোহিনী এখন ফার্স্ট এড নিচ্ছে চাঁদ আঁকা ফার্মেসিতে। ফার্মেসির ছোকরা সুদেহী। আরোহিনীও সুতনুকা বটে । আমরা কিছুই নিশ্চিত করে বলতে পারিনা । হয়ত তার য়্যুনিভার্সিটিতে যাওয়া আসার পথে পরস্পরের দৃষ্টিপথের কাটাকুটি হয়েছে প্রায়ই। হয়ত এরই ভেতর এই দুজনের মধ্যে অদৃশ্য মাকড়সা সুতো টানতে শুরু করেছে। ছোকরা বার কয়েক তাকিয়েছে আরোহিনীর ওড়নার অবাধ্য স্তনযুগলের দিকে। আরোহিনী ছোকরার চওড়া বুকে খোলা বোতামের ফাঁকে

কালো লোমের অন্ধকারে। এখানে একটা গল্পের শুরু হতে পারে। ভালো লাগালাগি অথবা প্রেমের। কিম্বা শুধুই শরীরের। কিন্তু সে গল্প আর কেউ বলবে।

আমরা তাকাই এলইডি স্ক্রিনে।

বিজ্ঞাপন। অনেক রং আর আলো আর শব্দের।

আমি দেখতে থাকি।

মৃত মানুষ তাকিয়ে দেখছে - এই অপ্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষ বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারেনা বলেই কি চোখ বুঁজিয়ে দেয়া হয়? আমার চোখ দুটো এখনো বুঁজিয়ে দেয়নি কেউ । চোখের সামনে সারি সারি মুখ, ঈষৎ ভারি আকাশ আর উজ্জ্বল এলইডি স্ক্রিন। আমি এসব দেখতে থাকি।

এবং আমি ভাবতে থাকি।

রোজ অসংখ্য ট্রাক আমায় পাশ কাটিয়ে যায়। আমি পাশ কাটাই ওদের। শহরের রাস্তায় এই বোঝাপড়া রোজ সঙ্গে নিয়ে বেরুতে হয়। ডান হিপ পকেটে মানিব্যাগ আর বামেরটায় রুমালের মত। আজ তবে হিসেবটায় কী ভুল হয়ে যায়? ঠিক কী কারণে ভুল বুঝে ট্রাকটি ছুটে আসে আমার দিকে? আমি হিসেবটা মেলানোর চেষ্টা করি।

বাতাস উঠেছিল সেসময়। কিছুটা ধুলোসহ বাতাস উড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল পুরোনো ফার্নিচারের দোকানের ত্রিপল। হুডতোলা রিকশাটা আসছিল আমার উল্টোদিক থেকে। এলইডি স্ক্রিনে নেচে চলেছে রংকরা নারী-পুরুষ।ট্রাকটা কি হর্ন বাজিয়েছিল? না বাজালেও ইঞ্জিনের গর্জন শোনার কথা। হতে পারে, এক মুহূর্তের জন্য আমি তাকিয়েছিলাম হুড তোলা রিকশাটির দিকে। চোখ পড়েছিল সুতনুকা আরোহিনীর ওপর। বাতাসে সরে গিয়েছিল ওড়না। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল আরোহিনীর পুরুষ্টু স্তনের অবয়বরেখা। আর আমার হিসেবে ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কিংবা যদি বয়ান নিই রিকশাওয়ালার। রিকশার রিং থেকে হাত সরেনা তার।

'লোকটা এই পচ্ছিম দিক থাকি আইল। আমি দ্যাখলাম রাস্তা পার হবার চায় মনে হয়। টেরাকটা ফাশটে আমিও দেখি নাই। এই দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা দিয়া ঝাঁপ দি পড়ল। আমি রিশকাটা এইদিক টানদিয়া নিলাম। লোকটা মনে হয় ধান্দা খাইসিল ঐ সময়টায়। আহহারে! এখ্খেরে প্যাটের উপর দিয়া দিসে ... ... '

একজনের বক্তব্যে ভক্সপপ হয়না। ভক্সপপ, অবয়বহীন মানুষের মুখের কথা। ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে। আমাদের এখানে 'মিডিয়া লিটারেসি' এক্কেবারে নেই -সেদিন আক্ষেপ করে বলছিলেন দ্যুতিময় অবয়বের একজন। আলোকিত স্ক্রিনে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে পৌঁছে যান তারা। যাদের মননশীলতায় ভক্সপপ হয়ে ওঠে মিডিয়া লিটারেট না হয়ে ওঠা সাধারণেরা। সেরকম সাধারণ একজনকে খুঁজে নিই, অবয়বহীন ভিড়ের কেউ। ওই যে উনি ...

'আমি? .. .. হ্যাঁ, ... ওই তো, ... এই জায়গাটাই খারাপ বুজছেন। প্রায়ই তো হয়...

ব্যক্তি নির্বাচনে কিছু অভিনবত্ব ধরা পড়ে। পেছনে কিছুদূরে একটা উৎকণ্ঠিত হাতে জ্বলে ওঠে লাইটার, জোরালো টানে লাল হতে থাকে সিগারেটের পশ্চাদ্দেশ। দৃশ্যপটের স্পটলাইটের মধ্যে পকেটের অন্ধকারে ব্যস্ত প্রতিক্রিয়া জানায় কিছুক্ষণ আগেও আমার পকেটে থাকা সনি-এরিকসন কে ফাইভ ফাইভ জিরো আঁকড়ে ধরা আঙুলগুলো।

ভক্সপপের সম্ভাবনা বদলে যেতে থাকে। ভাবনার ছেলেমানুষির দিকটাও জানান দেয় এইবার। সাধারণের মৃত্যু ভক্সপপের বিষয় হয়না। বেশিরভাগ মানুষের মতই অসাধারণ হয়ে ওঠার সুপ্ত সম্ভাবনা আর আকাঙ্খা অলস পাশ ফেরাতেই শেষ হয় আমারও।

পাশ দিয়ে আরেকটা ট্রাক চলে যায় । ভীড় সরার অবসরে অথবা শুধু কৌতুহলে যেতে যেতে একবার থেমে দেখে যায় আমায়। হয়ত চালকের সাবধান হওয়ার কথা মনে পড়ে যায় আজকের মত।

আমার চোখ ধাতব আকাশে স্থির। চোখের মাঝে আলোর প্রতিফলন দ্রুত বদলাতে থাকে।
এলইডি স্ক্রিন।

কি হচ্ছিল তখন ঐ স্ক্রিনে? রংদার কোনো বিজ্ঞাপনের ছবি? চিত্রনায়িকা সাবানের গুণগান করছে। আমি কি তাকিয়েছিলাম ঐ সাবান এবং নারীর দিকে? মুহূর্তের জন্য বুঝি চোখ আটকে গিয়েছিল এলইডির রঙিন আলোর জালে। আর পা দুটো পায়নি সময়মত ব্রেনের সঠিক সংকেত। হতেই পারে।

এলইডি সরিয়ে সিল্যুয়েট অবয়ব ফোটে। রঙিন আলোর রেশ মুছে ফেললে স্পষ্ট হয় তামাটে মুখ, ব্যাজ, ইউনিফর্ম। পুলিশ। কেউ থানায় খবর দেয়ার নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছে।
এদের সাথে আমার বিশেষ সম্পর্ক আছে। ক্রাইম। ওদের কাজ যেমন, আমারও পেশাগত দায়িত্ব ক্রাইম খোঁজা। ক্রাইম রিপোর্টার। যদিও ভীড় সরাতে সরাতে মুখের ওপর উঁকি দিল যে এসআই, তাকে আমি চিনিনা। তবে এই লোকটি আমার চিন্তায় একটা অ্যাডভেঞ্চারের উস্কানি নিয়ে এল।

ড্রাগ ট্রাফিকিং-এর একটা নেটওয়ার্কের বিষয়ে কাজ করছিলাম কিছুদিন থেকে। বেশকিছু তথ্য হাতে এসে যাচ্ছিল। পেয়ে গিয়েছিলাম কিছু মোক্ষম সোর্স।

গত পরশু একটা ফোন পাই। সহজ ভাষায় হুমকি। জানি এই পেশায় এসব ডালভাত, তবু প্রতিটি হুমকিই আজো আমায় একবার অন্তত অকাল প্রয়াত সহকর্মীদের মুখ মনে করিয়ে দেয়।
এমন কি হতে পারেনা, আদতে কোনো ভুল নয়; বরং ইট বোঝাই ট্রাকের হঠাৎ রাস্তার ডানদিক বেঁকে ছুটে আসা এবং পালিয়ে যাওয়া- সবই আসলে একটা সহজ অঙ্ক মেলানোর পরম্পরা?

সুতনুকা আরোহিনী নতুন রিকশা ডাকে। ভিড়ের দূরতম একজন হতে হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কে ফাইভ ফাইভ জিরো আঁকড়ে থাকা আঙুলে বদল হয় সিগারেটের শেষ টান ।
আমি অঙ্ক মেলাতে থাকি।

চোখের সামনে দিয়ে সরে যেতে থাকে অবয়বহীন মুখের সারি, ট্যাপ খাওয়া রিঙের রিকশা, চাঁদ আঁকা ফার্মেসি, আলোকিত এলইডি স্ক্রিন।
পুঞ্জিভূত মেঘের আকাশটা শুধু চলমান থাকে আমার সাথে।
আমার চোখ বুঁজিয়ে দেয়া হয়।

শরীরটা নিয়ে যাওয়া হ'ল মেডিকেলে। বয়সে তরুণ ডাক্তার ঘেঁটে দেখলেন ওটা। তার মনেও একবার পাক খেয়ে গেল হিসেবের হাওয়া। হতে পারে না কি, স্রেফ মাথা ঘুরে উঠেছিল লোকটার? সেই সময়টাতেই যা ঘটার ঘটে গেছে ? সেপর্যন্ত তো লোকটার পেটে কিছু পড়েনি। স্টমাক এক্কেবারে খালি।

খসড়া

আমার খাটটা ঠিক যেন একটা জাহাজ। বাড়িতে এলেই জিনিসপত্র নিয়ে আমি আমার খাটে উঠে পড়ি। খসখসে পাতাওয়ালা আগোছালো একটা খাতা, ঘন কালির কলম, একটা গাঢ় মোটা পেন্সিল। এরপর সারাদিন উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা।
আমার জাহাজ শান্ত সমুদ্র; লাগোয়া দেওয়ালে খুপরির ভেতর শিক বসানো জানালা, মেঝেটা সমুদ্র। জানালার ওপাশে গাছপালা ঝোপঝাড়, জঙ্গলের দিক থেকে এলাচ দারচিনির গন্ধ ভেসে আসে। ফাঁকফোকর দিয়ে আলো লেগে সবুজ পুকুরের ঝিক ঝিক, মাথার উপর ছাদের বদলে একটা খোলামেলা নীল আকাশ আমি কল্পনা করে নিই।

সকালবেলায় রোদটা খাটের মাথায় এসে গড়াগড়ি করে, আমি আলসের মত শুয়ে আছি। ছোট্ট, ঘেঁষাঘেঁষি, সবু একফালি খাট। খাতার ভাঁজ থকে আলগা কাগজগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে চায়। অন্য কথা ভাবতে ভাবতে আমি একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করি। উপসাগরীয় হাওয়া, দক্ষিণের প্রবাল দ্বীপ, বোতল সবুজ সমুদ্র-এই সব- কবিতাটা দাঁড়ায় না। আমি তখন খাতা সরিয়ে কাঁসার বাটিটা থেকে আঁচার চাখি। বাইরের ভেজা সবুজ গাছপালা দেখি তাকিয়ে। আর মনে মনে লাগাতার ভেসে যাচ্ছি।

চলছি, আর চলছি, কোথায় যেন যাচ্ছি আমি... ... তারপর অর্ধেকটা কবিতার ওপর এলোমেলো পেন্সিল ঘষাঘষি, ঘনকালো মিশমিশে, প্রায়ই একটা গম্ভীর মেঘের মত হয়ে যায়। জলপাই-তেল রঙা রোদটা আস্তে আস্তে আমার খাতার উপর এসে শুয়ে পড়ে। হলদেটে সাদা পাতাটা কেমন উষ্ণ দেখায়। প্রায়সময়ই আমি দুহাতে মুখ গুঁজে টুকটাক ঘুমিয়ে নিই।
রোদটা আস্তে ধীরে আমার গায়ের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে পায়ের দিকে চলে যায়। কমলা রোদ, লালচে রোদ, উত্তাপহীন নেই-রোদ। বাইরের দিকের কাজকর্ম সেরে আমার মা, চাচী, দাদী সবাই ঘরে আসতে থাকে। একজন দুজন করে এদিক ওদিক বসে, আড্ডা জমায়, হাঁটাহাঁটি করে। আমার জাহাজটা এখন ইঁট বাঁধানো বটতলা। দাদী জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি খাতা মুড়ে উঠে বসি। তেলে ভাজা, মুড়ি মাখা, আর ধোঁয়াশা চা। আড্ডা। আমি খাতা-কলম, পেন্সিল আর জাহাজটা জানালার খুপরিতে তুলে রেখেছি। কালকে সকালে আবার বের করব।